প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন উপলক্ষে প্রকাশিত

Published on the occasion of the World Environment Day 5 June 2023

উপদেষ্টা
ড. আবদুল হামিদ

প্রধান সম্পাদক
কাজী আবু তাহের

সম্পাদক
সৈয়দা মাছুমা খানম
মোঃ জিয়াউল হক
ড. মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম
মির্জা শওকত আলী
ফরিদ আহমদ
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
রেজাউল করিম
মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী
একেএম রফিকুল ইসলাম
মোঃ হাসান হাছিবুর রহমান
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
খন্দকার মাহমুদ পাশা
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
শোয়াইব মোহাম্মদ শোয়েব
কাজী নাজমুল মাহমুদ
মোঃ রুহুল আমীন খান

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত
Published by the Director General, Department of Environment

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ০২-২২২২১৮৫০০, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, ফেসবুক: facebook.com/doebd

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানব সম্প্রদায় ও প্রাণিকুলের অস্তিত্বের জন্য দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের বিকল্প নেই। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপায়ে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করছি। পরিবেশ দূষণকে আরো বেশি সমস্যাসংকুল করে তুলেছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের অপরিকল্পিত ব্যবহার। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হচ্ছে, যার অর্ধেক হলো শুধু একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক অর্থাৎ Single Use Plastic এবং এগুলোর বেশিরভাগ পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়। প্লাস্টিক সহজে পঁচে না এবং ক্ষয় হয় না। ফলে জলাভূমি, নদ-নদী ও সমুদ্রে প্রবাহিত হয়ে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্লাস্টিক দূষণ শুধু সামুদ্রিক প্রতিবেশ নয়, পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রতল পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিবেশে বিরাজমান জীববৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের জন্য একটি দৃশ্যমান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'Solutions to Plastic Pollution' যার ভাবার্থ 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং এবারের স্লোগান: Beat Plastic Pollution যার ভাবানুবাদ, 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, ভোক্তাসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে প্লাস্টিক পণ্যের পুনঃব্যবহার ও এর টেকসই বিকল্প উদ্ভাবন খুবই জরুরি। প্রকৃতির অক্ষুণ্নতা বজায় রেখে সবাই মিলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ করবো এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সুন্দর সোনার বাংলা বিনির্মাণ করবো- এটাই হোক সকলের ব্রত।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Solutions to Plastic Pollution' অর্থাৎ 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং সম্পদের অপরিমিত ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ অনেকটাই বিপর্যস্ত, হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বিশ্বব্যাপী গত ৭০ বছরে প্লাস্টিকের বহুমুখী ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বিশেষ করে একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের অত্যধিক উৎপাদন, যত্রতত্র ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং উর্বর কৃষি জমি থেকে শুরু করে জলাশয়ের প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফুড চেইনের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী, গবাদি পশু ও মানুষের দেহে মাইক্রো প্লাস্টিক প্রবেশ করছে। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ক্যান্সার ও বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই, প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস, প্লাস্টিকের পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন বৃদ্ধি এবং প্লাস্টিকের কার্যকর বিকল্প উদ্ভাবনের এখনই সঠিক সময়।

প্লাস্টিক দূষণ ও এর সমাধানের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে United Nations Environment Assembly (UNEA) ইতোমধ্যে একটি Intergovernmental Negotiating Committee (INC) গঠন করেছে; যা প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের লক্ষ্যে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে একটি Legally Binding Agreement-এর খসড়া প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এর মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে বিশ্ববাসী সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে। টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Multisectoral Action Plan 2021-2030 প্রণয়ন করেছে, যেখানে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে Circular Material-এর ব্যবহার বৃদ্ধি, একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস, প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃচক্রায়নের হার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি এবং বাৎসরিক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার প্লাস্টিকের উৎপাদন হ্রাস ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর মাধ্যমে পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহন, মজুত ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন, ২০১০ ও পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক বিধিমালা, ২০১৩-এর মাধ্যমে পলিথিনের বিকল্প পাটের শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে আমাদের সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যাতে প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বিধিব্যবস্থা পরিপালন করা হয় সেদিকে বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এছাড়াও, সমন্বিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে 'National Adaptation Plan (NAP) 2023-50', Updated 'Nationally Determined Contribution (NDC) 2021' এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) 2022-41' প্রণয়ন করেছে।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের টেকসই ব্যবস্থপনায় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৫ জুন ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) কর্তৃক এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Solutions to Plastic Pollution' যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- #BeatPlasticPollutions যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'।

UN Environment Programme-এর এক হিসাবে জানা যায়, গত শতকে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে তার চেয়ে গত এক দশকে উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিমাণ অনেক বেশি। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে পতিত হয়। যার অর্থ হচ্ছে প্রতি মিনিটে এক ট্রাক প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে পতিত হচ্ছে। প্লাস্টিকজাত বর্জ্য জৈবপচনশীল না হওয়ায় এবং দীর্ঘকাল পরিবেশে অবস্থান করার কারণে প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অপরদিকে অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা সামুদ্রিক প্লাঙ্কটন, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মাধ্যমে খাদ্যচক্রে প্রবেশ করছে এবং সামুদ্রিক লবণেও এই ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার উপস্থিতি ব্যাপকভাবে পাওয়া গিয়েছে। খাদ্যচক্রের মাধ্যমে এই দূষক মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় UN Environment Programme-এর এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য যথাযথ হয়েছে।

পলিথিন ব্যাগ ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য সারা পৃথিবীতে সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় মূলত এর ব্যবহার দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব যে কত ভয়াবহ তা আধুনিক বিশ্ব আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। ফলে পৃথিবীর অনেক দেশ ইতোমধ্যে এর ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর মাধ্যমে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবৈধভাবে ও গোপনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনও পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদনকারী, মজুত ও বাজারজাতকারী এবং ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করছে। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতাবোধের অভাব এবং ব্যাপক চাহিদার কারণে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার থেকে আমরা পুরোপুরি বিরত থাকতে পারবো না। তবে এসব সামগ্রীর ব্যবহার আমরা সীমিত করতে পারি। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সকল ধরনের প্লাস্টিকের পুনঃব্যবহার অথবা পুনঃচক্রায়ন। এ লক্ষ্যে উৎসমূলে এসব বর্জ্যের সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প হিসেবে জৈবপচনশীল পলিব্যাগ এবং পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়টি আরো ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সুশীল সমাজ এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আসুন আমরা পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি এবং সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে একযোগে ৫ জুন ২০২৩ তারিখে ৫০তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দিবস উদযাপন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের উদ্ভাবনী ও রূপান্তরমূলক কার্যক্রমসমূহ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ বছর প্লাস্টিক দূষণকে গুরুত্ব দিয়ে UN Environment Programme (UNEP) কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Solutions to Plastic pollution' যার বাংলা ভাবানুবাদ- 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং স্লোগান ঠিক করা হয়েছে- #BeatPlasticPollution যার বাংলা ভাবানুবাদ- 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ' যা সময়োপযোগী হয়েছে মর্মে আমি মনে করি।

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়, যার অর্ধেক একবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং ১০ শতাংশের কম পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিকের এই ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে বাংলাদেশেও প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রতিদিন প্রায় ৬,৫০০ টন কঠিন পৌর বর্জ্য উৎপন্ন হয় এবং এর প্রায় শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬৫০ টন হলো প্লাস্টিক বর্জ্য, যার অধিকাংশই একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য। এই বর্জ্যের শতকরা মাত্র ৩৭ ভাগ পুনঃচক্রায়ন হয়। এক হিসাবে দেখা যায়, দেশে প্রতিবছর প্রায় ২৪-৩৬ হাজার টন প্লাস্টিক খাল-বিল, নদী-নালায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক (৫ মিমি ব্যাস পর্যন্ত) বা ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা খাদ্য, পানি এবং বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তি প্রতি বছর ৫০,০০০ এরও বেশি প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা গ্রহণ করে। প্লাস্টিক পোড়ানোর মাধ্যমেও সৃষ্ট মাইক্রোপ্লাস্টিক মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করছে।

সরকার প্লাস্টিকসহ অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ জারি করেছে। উক্ত বিধিমালার মূলনীতি হিসেবে বর্জ্য প্রত্যাখ্যান, হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (Extended Producer Responsibility-EPR) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্লাস্টিক সামগ্রীর টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার একটি মাল্টিসেক্টরাল এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এই প্ল্যানে চারটি কৌশলের আওতায় চারটি সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।

স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশের উপর প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রোধ এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে প্লাস্টিকের উৎপাদন, আমদানি, ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন সফল হোক, এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সভাপতি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

পৃথিবী নামক গ্রহ, তার সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশেও আজ আমরা 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করছি। ১৯৭২ সনে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের স্মরণে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) কর্তৃক এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Solutions to Plastic Pollution', যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে'। এছাড়া এ বছরের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে #BeatPlasticPollution, যার ভাবার্থ 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। সারা বিশ্বে প্লাস্টিক দূষণ একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রধান এ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে আমাদেরকে যে নতুন করে ভাবতে হবে তা এ বছরের প্রতিপাদ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভিন্ন কাজে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার এখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ প্লাস্টিক টেকসই, বিবিধ কাজে ব্যবহারোপযোগী, সস্তা কিন্তু অপচনশীল। প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ ব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রী যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে সেগুলো পরিবেশে পুঞ্জীভূত হয়ে মারাত্মক প্লাস্টিক দূষণ সৃষ্টি করছে। এ প্লাস্টিক দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, এমনকি মানুষও। প্লাস্টিক বর্জ্যের অনিরাপদ পরিত্যাজনের কারণে ঘটছে জলাশয় দূষণ, হ্রাস পাচ্ছে মাটির উর্বরতা এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। জলজ প্রাণী বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রাণী মারাত্মক প্লাস্টিক দূষণের শিকার হচ্ছে। সমুদ্রের প্লাস্টিক বর্জ্যে আটকে গিয়ে কিংবা প্লাস্টিক দ্রব্য খাবার ভেবে খেয়ে ফেলার কারণে মারা যাচ্ছে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী।

আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, প্লাস্টিক দূষণ একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্লাস্টিক ফুটপ্রিন্ট কমাতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদেরকে প্লাস্টিক সামগ্রী পরিহার, ব্যবহার কমানো, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন করতে হবে এবং একইসাথে যত্রতত্র প্লাস্টিক সামগ্রী নিক্ষেপের অভ্যাসও পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয়ের হাত হতে ধরিত্রীকে বাঁচানোসহ সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ৫ জুন ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এর তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য-' Solutions to plastic pollution ' যার ভাবার্থ- 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে ' এবং স্লোগান- #BeatPlasticPollutions যার ভাবার্থ- 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ' যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

পৃথিবীর নগর সভ্যতা বিকাশের সাথে নগরজীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে প্লাস্টিক সামগ্রী (প্লাস্টিক/পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক মোড়ক ও অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য) ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে বহুগুণে। তুলনামূলক স্বল্প মূল্য, সহজলভ্যতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় গত কয়েক দশকে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক সামগ্রীর একটি বড় ক্ষতিকর দিক হলো এগুলো সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং বছরের পর বছর প্রাকৃতিক পরিবেশে (সমতল ভূমি, পাহাড়, জলাভূমি,সমুদ্র ইত্যাদি) অবস্থান করে বিভিন্নভাবে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীব সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা (Microplastics) খাদ্যচক্রে প্রবেশ করায় মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) এর তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বে বছরে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টনের অধিক প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন হয়ে থাকে যার অর্ধেকই হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। প্রতিবছর ১১০ লক্ষ টনের অধিক প্লাস্টিক সামগ্রী সমুদ্রে পতিত হয়, যা ২০৪০ সাল নাগাদ পরিমাণে তিনগুণ হতে পারে। প্রতি বছর প্রায় ৮০০ প্রজাতির সামদ্রিক প্রাণী খাবার গ্রহণ ও অন্যান্যভাবে প্লাস্টিক দূষণের শিকার হয়। সার্কুলার ইকোনমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সমুদ্রে নিপতিত প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিমাণ ২০৪০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস করা যেতে পারে।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে পলিথিন বা পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, আমদানি, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত, বিপণন ও ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত বন্ধ করা হয়েছে। তবে পলি প্যাকেজিং এর বিকল্প না থাকায় পলিথিনের ব্যবহার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে দেশে পাটতন্তু থেকে প্রাপ্ত সেলুলোজ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈবপচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশের উদ্ভাবিত জৈবপচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশ সহজলভ্য হওয়ায় সরকার এ ধরনের বায়ো-ব্যাগ ও বায়ো প্যাকেজিং শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া National 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Strategy বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্লাস্টিক ও পলিথিনজাত বর্জ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে প্লাস্টিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (Extended Producer Responsibility-EPR) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় ১০টি জেলায় প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে তিন বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত সুন্দর ও টেকসই পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজন সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩-এর গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

ড. ফারহিনা আহমেদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme) কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Solutions to Plastic Pollutions' যার বাংলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে: 'Beat Plastic Pollution' যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'।

ক্রমবর্ধনশীল আধুনিক বিশ্বের অগ্রযাত্রায় প্লাস্টিক খুবই উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এক হিসাবে দেখা যায়, গত শতকে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে তার চেয়ে গত এক দশকে উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিমাণ বেশি। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে পতিত হয়। যার অর্থ হচ্ছে প্রতি মিনিটে এক ট্রাক প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে পতিত হয়। প্লাস্টিক একটি অপচনশীল অর্থাৎ Non-biodegredable পণ্য যা পরিবেশে দীর্ঘসময় বিদ্যমান থেকে পরিবেশের ক্ষতিসাধন যথা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, মাটির উর্বরতা নষ্ট করাসহ ড্রেনেজ সিস্টেমের ক্ষতি সাধন করে। অধিকন্তু, অপচনশীল প্লাস্টিক ধীরে ধীরে ভেঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিক-এ পরিণত হয়ে যা পরবর্তীতে খাদ্য শৃংখলে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এবারের প্রতিপাদ্য 'Beat Plastic Pollution' যথাযথ হয়েছে।

পলিথিন শপিং ব্যাগ এবং প্লাস্টিকজাত পণ্য সারা বিশ্বে সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকতর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব সারা বিশ্ব আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহ প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশে শহরগুলোতে দৈনিক প্রায় ৩০,০০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যা আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক প্রায় ৪৭,০০০ টনে উন্নীত হবে। বড় শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্যের প্রায় ১০% অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ৩,০০০ টন প্লাস্টিকজাত বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৮,২১,২৫০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। যেখানে ২০০৫ সালে প্লাস্টিক ব্যবহারের মোট পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ মে.টন, সেখানে ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্লাস্টিকের মোট ব্যবহার হয় ১.২ মিলিয়ন মে.টন। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিগত ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন, ব্যবহারকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। পলিথিন উৎপাদনের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। পরিবেশ আইন অমান্য করে অর্থাৎ অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ যারা উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রয় এবং মজুদ করছে তাদেরকে মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্টের আওতায় এনে নিয়মিত জরিমানা ধার্য ও আদায় করা হচ্ছে এবং অবৈধ পলিথিন সামগ্রী জব্দ ও উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

পরিবেশসম্মত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বলবৎ করার পাশাপাশি বিগত ২০১০ সালে 3R (Reduce, Reuse, Recycle) policy গ্রহণ করেছে। উক্ত বিধিমালায় ব্রান্ড ওনার্স বা আমদানিকারকের Extended Producer Responsibility (EPR) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্লাস্টিক বর্জ্যের Circular Economy বিষয়ক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে ২০২১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ জেলার ৪০টি উপজেলাকে কোস্টাল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায়, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রণীত 'Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh' এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০% Virgin Material ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিতকরা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্লাস্টিকজাত বর্জ্যসমূহ পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ তথা এ বিষয়ে অধিকতর জনসচেতনতা প্রয়োজন। এছাড়াও এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি এর বিকল্প বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকসহ পচনশীল পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগের প্রচলন করা প্রয়োজন। এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, প্রকৃতিই আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা করতে হলে আমাদেরকে প্লাস্টিকের ব্যবহার সীমিত করার পাশাপাশি এর পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করতেই হবে। এটি ব্যতিরেকে পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর ১০ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বির্তক প্রতিযোগিতা, শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্লোগান প্রতিযোগিতা, বিটিভিতে টকশোসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে আজ থেকে সপ্তাহব্যাপী পরিবেশ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

সর্বশেষে, আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩-এর সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ এবং টেকসই পরিবেশ সুরক্ষায় সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ড. আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৫ জুন ২০২৩

সম্পাদকীয়

পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল উন্নয়নকে টেকসই করার বিষয়ে যথার্থ দায়িত্বশীলতা ও কার্যকর গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও ২০২৩ সালের ৫ জুন বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) কর্তৃক এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য (Theme) নির্ধারণ করা হয়েছে "Solutions to Plastic Pollution" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে "প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হই সকলে"। স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "#BeatPlasticPollution" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে "সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ"।

বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণসহ বিভিন্ন ধরনের দূষণ সৃষ্টি করে প্রতিবেশের বহনক্ষমতার অতিরিক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা, প্রকৃতির উপর দুর্বিনীত আধিপত্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কারণে আবহমানকালের প্রকৃতি ও জীবনধারা প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের সর্বব্যাপী ব্যবহার; নদী-জলাভূমি-অরণ্যবিনাশ; বন্যপ্রাণী, পাখি, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস ধ্বংস; প্রাকৃতিক দুর্যোগ; দায়িত্বজ্ঞানহীন ভোগ ও অপরিকল্পিত উৎপাদন; জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য অভিঘাত; অতিমারি রোগ-বালাই; এবং অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দারিদ্র্যসহ নানান অবাঞ্ছিত দুর্বিপাক প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এই অবস্থায়, ধরিত্রীকে সুরক্ষা করার তাগিদ এসেছে পৃথিবীজুড়ে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক এর নির্দেশনা "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর তার স্বল্প জনবল ও সীমিত বাজেট বরাদ্দ নিয়ে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আনন্দিত, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্মরণিকায় মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী; মাননীয় উপমন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। এ জন্য তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। লেখা দিয়ে যারা স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই স্মরণিকায় প্রকাশিত সকল লেখায় সম্মানিত লেখকদের পর্যবেক্ষণ, মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ একান্তই তাদের নিজস্ব।

প্রিয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য উচ্চারণ করেছেন " এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে। চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি- নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করাই হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

কাজী আবু তাহের

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে
একাদশ জাতীয় সংসদের
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির
মাননীয় সদস্যগণের
সদয় দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য
আমরা কৃতজ্ঞ

জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী
সভাপতি

জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন
সদস্য

বেগম হাবিবুন নাহার
সদস্য

জনাব আনোয়ার হোসেন
সদস্য

জনাব নাজিম উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

জনাব তানভীর শাকিল জয়
সদস্য

জনাব জাফর আলম
সদস্য

জনাব মোঃ রেজাউল করিম বাবলু
সদস্য

বেগম খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন
সদস্য

জনাব মোঃ শাহীন চাকলাদার
সদস্য

সূচি

বাংলা প্রবন্ধ

পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিক দূষণসহ অন্যান্য দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর ড. আবদুল হামিদ	১৯
রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপণ ও বাঘশিকার ইনাম আল হক	২৩
ভোঁদড়ের ধ্রুপদী নৃত্য শরীফ খান	২৬
বাঘের চোখ মনিরুল খান	৩১
প্লাস্টিকে গিলছে পরিবেশ মুকিত মজুমদার বাবু	৩৪
শব্দদূষণ: একটি ভয়ানক আতঙ্ক মোঃ জাফর সিদ্দিক	৩৬
ম্যানগ্রোভ বনসৃজন: ব্লু কার্বন-প্রাপ্তির নবদিগন্ত মোঃ আরিফুজ্জামান আরিফ ও কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাসমী	৪০
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ বাড়তে পারে অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার	৪৩
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমি অবক্ষয় রোধের প্রয়োজনীয়তা: UNCCD প্রেক্ষিত ড. মুঃ সোহরাব আলি ও ফারহানা মুস্তারী	৪৯
বায়ুদূষণের কারণ, স্বাস্থ্যগত প্রভাব ও পদক্ষেপ নাজিম হোসেন শেখ	৫১
নেদারল্যান্ডস সম্পর্কিত কিছু কথা দিলরুবা আক্তার	৫৫
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি হেবা দলিল খন্দকার মাহমুদ পাশা ও আফরোজা ইসলাম শশী	৬০
বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বন সৃজনে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষণা সাফল্য মোহাঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া	৬২
জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশ বিপন্ন যেভাবে হাসান জাহিদ	৬৭
বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা তাসমিন বাশার যারিন	৭১
ভবিষ্যৎ জ্বালানি সংকটের যুগোপযোগী সমাধান শাহরীন তাবাসসুম	৭৩
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই নগরায়নে পরিবেশবান্ধব আবাসন নাঈম শাহরিয়ার	৭৬

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য: আইনের পরিকল্পিত বাস্তবায়ন চাই বিধানচন্দ্র পাল	৮১
স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি মোঃ জিয়াউর রহমান	৮৪
প্রকৃতির উদারতা ও আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা! কাজী নাজমুল মাহমুদ ও ফাতেমা-তুজ-জোহুরা	৮৮

কবিতা ও ছড়া

একটি সরল প্রার্থনা ও নতুন জীবনের তাগিদে মনিরুজ্জামান বাদল	৯৩
দূষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ পাশা মোস্তফা কামাল	৯৪
আহ্বান ও নদীর জন্য শোকগাথা সাজেদ ফাতেমী	৯৫

ENGLISH ARTICLES

World Day to Combat Desertification and Drought: Global to Local Context Dr. Md. Sohrab Ali	99
Implementation Challenges of Kigali Amendment Md. Ziaul Haque	103
Bangladesh is now POPs Pesticide Dichlorodiphenyltrichloroethane FREE!! Farid Ahmed	108
Building A Resilient Future: Establishing A National Mechanism for Loss & Damage in Bangladesh Md. Mahmud Hossain	115
Nature-based Solution in Mitigating the Increase of CO_2 in the Atmosphere Originating from Anthropogenic Emissions Muha Abdullah Al Pavel & Kamrun Nahar Mukta	122
Beewax Wrap: Potential Substitute for Plastic Wrap Dr. Maksuda Hossain	127
The Impact of Plastic Pollution on Bangladesh and its Possible Solution Md. Alim Miah	130
Soil Salinity and its Impacts on Crop Agriculture in the Coastal Areas of Bangladesh: A Comprehensive Analytical Review Umme Salma Sumi & Md. Harun Or Rashid	135
International and Bangladesh Perspective of Electronic Waste Management: Some Solution Proposals Sabbir Ahammed & Others	142
চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৪৭

বাংলা প্রবন্ধ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গ্রুপে শ্রেষ্ঠ মাশহুন জাহান মুগ্ধের আঁকা চিত্র

পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিক দূষণসহ অন্যান্য দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর

ড. আবদুল হামিদ*

পরিবেশের অবস্থা নিরীক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি ও জনগণ পর্যায়ে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এতদবিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের মানব পরিবেশের উপর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আলোকে ১৯৭২ সালে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি ইউএনইপির উদ্যোগে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ইউএনইপি, যার বর্তমান নাম জাতিসংঘ পরিবেশ (UN Environment), প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'Solutions to Plastic Pollution' যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং স্লোগান নির্ধারিত হয়েছে 'Beat Plastic Pollution' যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ও স্লোগানের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের স্বার্থে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মৌলিক আইন সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" (পঞ্চদশ সংশোধনী)। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীয় ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে "পরিবেশ সুরক্ষা" অন্যতম । ফলে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ বিষয়ক কারিগরি সংস্থা হিসেবে সরকারের এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

তুলনামূলক স্বল্প মূল্য, সহজলভ্যতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় নগরজীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে গত কয়েক দশকে প্লাস্টিক সামগ্রী যেমন: প্লাস্টিক/পলি ব্যাগ, প্লাস্টিক মোড়ক ও অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ-এর এক তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতিবছর ৫০ হাজার কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ, ৪৮ হাজার কোটি পানীয় বোতল উৎপন্ন হয় এবং প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষ প্লাস্টিক বোতল বিক্রি হয়। এই প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে প্রতি বছর ১ কোটি ৭০ লক্ষ ব্যারেল তেল ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার প্লাস্টিক কাঁচামাল আমদানি হয় এবং কোটি কোটি প্লাস্টিকের বোতল ও পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরগুলিতে দৈনিক প্রায় ৩০,০০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ আমাদের শহরগুলিতে দ্রুত নগরায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে প্রতিদিন প্রায় ৪৭০০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদন হবে এবং উৎপাদিত এই কঠিন বর্জ্যের প্রায় ১০% হবে প্লাস্টিক বর্জ্য।

ইউএনইপি এর তথ্য মতে বৈশ্বিকভাবে মোট উৎপাদিত প্লাস্টিকের অর্ধেক একক-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হচ্ছে এবং তারপরে ফেলে দেওয়া হয়। যদি এভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে প্লাস্টিকের বৈশ্বিক উৎপাদন ২০৫০ সালের মধ্যে ১১০০ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে। অন্যদিকে প্রতি বছর প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে আমাদের মহাসাগরে ৭৫ থেকে ১৯৯ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পাওয়া যায়। সামুদ্রিক কাছিম, পাখি এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রায় অর্ধেকসহ অনেক জলজ প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রে মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এ কারণে সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটন, শেলফিশ,পাখি, কাছিম এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী, প্রবাল, ম্যানগ্রোভ এবং সামুদ্রিক ঘাস প্লাস্টিকের বর্জ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি মানবদেহের ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা এবং কিডনির মধ্যেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় নবজাতক শিশুদের প্লাসেন্টাতে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এছাড়া বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, যেমন মিথাইল পারদ, বিসফেনল এ, থ্যালেটস এবং পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিলস (পিসিবি) মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এ সকল রাসায়নিক

*মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

পদার্থ, শরীরে প্রবেশ করে হরমোনের পরিবর্তন, আচরণগত ব্যাধি, অন্তঃস্রাবের ব্যাঘাত, বিকাশজনিত ব্যাধি, প্রজনন অস্বাভাবিকতা এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে উপরে বর্ণিত ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াও শহরের পানি নিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ হয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে অকার্যকর করা, ভূমির উর্বরতা হ্রাস করাসহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত দেশে পলিইথিলিন বা পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, প্রদর্শন, মজুত, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার বন্ধ করেছে। বর্তমানে দেশে পাটতন্তু থেকে প্রাপ্ত সেলুলোজ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈবপচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশে জৈবপচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক ক্রমশ সহজলভ্য হওয়ায় এ দেশেও এ ধরনের বায়ো-ব্যাগ ও বায়ো-প্যাকেজিং শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্লাস্টিক ও পলিথিনজাত বর্জ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থার উন্নতি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তথা বর্জ্য স্থানান্তর, পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ২০ ধারার ক্ষমতাবলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ প্রণীত হয়েছে যা ৯ই ডিসেম্বর ২০২১ হতে কার্যকর হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দা, পণ্য প্রস্তুতকারী বা ব্রান্ডের মালিকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো ব্রান্ড ওনার্স বা আমদানিকারকদের Extended Producers Responsibility (EPR) এর আওতায় করণীয় যথা আর্থিক বা কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

মহামান্য হাইকোর্ট থেকে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার, বহন, বাজারজাতকরণ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণসহ দেশব্যাপী ও বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার হোটেল, মোটেল বা রেস্টুরেন্টগুলোতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ নির্দেশনার আলোকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২১ জুন ২০২১ তারিখে উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ জেলার ৪০টি উপজেলাকে কোস্টাল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সকল ধরনের প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১০ বছর মেয়াদী 'Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত অ্যাকশন প্লানে প্লাস্টিক/পলিথিন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদী যেমন স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত অ্যাকশন প্লানে ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০% ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক পরিসরে প্লাস্টিক দূষণরোধে ২০২২ সালের জুন মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত UNEA-5.2 সেশনে গৃহীত Resolution-5/14 এর মাধ্যমে 'End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument' এর প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে এ বিষয়ে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। তদুপরি, South Asian Cooperation of Environment Program (SACEP) এর Plastic free Rivers and Seas Program (PLEASE)-এর আওতায় ট্রান্স বাউন্ডারি প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক " Integrated Approach towards sustainable plastics use and Marine litter prevention in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিবেশ আইন অমান্য করে অর্থাৎ অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদনকারী, পরিবহনকারী, বিক্রয়কারী এবং মজুদদারকে মোবাইল কোর্টের আওতায় এনে নিয়মিত জরিমানা ধার্য ও আদায় করা হচ্ছে এবং অবৈধ পলিথিন সামগ্রী জব্দ, কারখানাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ সাল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ২১৯৮টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৬১৭টি মামলা করে ৫৪,২৮৮,০০০ টাকা ধার্য করে ৫৪,২১৮,৬০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ১৬৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৭৪৫.৪০ মেঃ টঃ পলিথিন, দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে। পলিব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, ব্যবহার বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা

রয়েছে তা কার্যকর করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, বিভিন্ন বাজার সমিতি, পলিথিনের বিকল্প সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে বিভিন্ন সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া, অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে Polluters Pay Principle কৌশলের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জুলাই ২০১০ হতে জলাশয় ভরাট, পাহাড়/টিলা কর্তন, কৃষিজমির ক্ষতি, নদীর পানিদূষণ, বায়ুদূষণসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১০-২০২৩ সময়ে ১২১৩১টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৮৬.৯১৩ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ২৩৭.৬২ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং তরল বর্জ্যের শূন্য নির্গমন (Zero Liquid Discharge) প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রচলনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত দেশে মোট ২৪২৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, আধুনিক ও ডিজিটাল উপায়ে শিল্পকারখানা মনিটরিং করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার শিল্পকারখানায় ইটিপিতে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৪৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এরূপ ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে বায়ুদূষণ মনিটরিংয়ের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা মহানগরে ৩টি, চট্টগ্রাম মহানগরে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী শহর এবং ঢাকার সাভারে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬টি স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station-CAMS) স্থাপন করেছে। এছাড়া বায়ুমান পরিবীক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলা শহরে আরও ১৫টি স্থানান্তরযোগ্য কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি CAMS ও C-CAMS এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্ধারিত Nationally Determined Contribution (NDC) পর্যালোচনা (Review) ও হালনাগাদ (Update) করণপূর্বক UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তার নিমিত্ত First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা তৈরিসহ উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়নে অংশীজনদের দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি; শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে দূষণের মাত্রা, উৎস এবং এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) এর মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জানুয়ারি ২০১৯ সাল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৫২২টি অভিযান পরিচালনা করে ২৬৭৩টি মামলা করে ২৯,৪২,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং ১৬৫৫টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ১৪ মোতাবেক তফসিল-১ এর অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অক্টোবর ২০২১ হতে শুরু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১,৫৬৫টি ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ ১,৪৪,৬৯,২৫০ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। অন্যদিকে বিপজ্জনক বর্জ্য বাংলাদেশ হতে অন্য দেশে রপ্তানির নিমিত্ত ট্রান্সবাউন্ডারি চলাচলের ক্ষেত্রে বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী Prior Informed Consent (PIC) প্রদান ও গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের এমএসডি গোডাউনে প্রায় ৩৬ বছর যাবত সংরক্ষিত নিষিদ্ধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০ মেঃ টঃ DDT পরিবেশসম্মতভাবে ধ্বংসকরণের লক্ষ্যে ১৪টি দেশে Transit এর জন্য উক্ত দেশসমূহ হতে Basel Convention অনুযায়ী Prior Informed Consent (PIC) গ্রহণ করে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইড, মৎস্য খাদ্য ও এর উপকরণের আমদানি/নিবন্ধনের লক্ষ্যে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, রোটারডাম কনভেনশন রেটিফিকেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কনভেনশন অনুসারে Hazardous, Restricted and Ban Chemical/Pesticide বাংলাদেশে আমদানির ক্ষেত্রে Explicit Consent/Export Notification প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সম্প্রতি চিকিৎসা বর্জ্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধির ফলে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত শ্রেণিবিন্যাস, ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়নের ফি হালনাগাদপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধন করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে UN Convention on Biological Diversity স্বাক্ষর করে এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে কার্টাহেনা প্রোটোকল ও ২০১১ সালে নাগোয়া প্রোটোকল স্বাক্ষর করে। জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ জারি করে এবং ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করে। সমুদ্র সম্পদের টেকসই আহরণ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystem" সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় "A Study Report on the Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystem" প্রণয়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে কোনো নৌ/জাহাজ দুর্ঘটনার কারণে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় অথবা নদী, লেক, জলাভূমি ও প্লাবনভূমিতে তেল ও রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP) প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২০-২৫ মেয়াদে বরেন্দ্র এলাকা ও হাওর এলাকায় Ecosystem-based Approaches to Adaptation (EbA) in the Drought-Prone Barind Tract and Haor Wetland Area Project (EbA Project) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইবিএ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিবার্য অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম হিসেবে বরেন্দ্র ও হাওর এলাকায় মজাপুকুর পুনঃখনন, বদ্ধ খাল পুনঃখনন, বনায়ন, সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের পরিবেশ দূষণমুক্ত একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য দেশ গড়ার সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষার প্রচেষ্টায় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাবসহ অন্যান্য পরিবেশ দূষণমুক্তকরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপণ ও বাঘশিকার

ইনাম আল হক*

আজ থেকে শতবর্ষ আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রশিক্ষক নিয়ে ১৯২৮ সালে ধুমধাম করে তিনি গাছ লাগাতে শুরু করেন। সেই বৃক্ষরোপণটা শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়।

তার সাত-আট বছর পর বৃক্ষরোপণ উৎসবটিকে শান্তিনিকেতনের বাইরেও সম্প্রসারিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির মৃত্যুর পর ১৯৪১ সাল থেকে তাঁর প্রয়াণদিবসেই বৃক্ষরোপণ উৎসব করা হত। তবে বৃক্ষরোপণের মুল্য বুঝতে ভারতবর্ষের জনতার অনেক দিন লেগে গেছে।

কৈশোরে বাঘ-শিকারে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছিল রবিঠাকুরের। সেটা ১৯ শতকের কাহিনী। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কিশোর রবীন্দ্রনাথ দু'বার শিলাইদহে বাঘ-শিকারে বেরিয়েছিল। এক যাত্রায় জ্যোতিদাদার বন্দুকের গুলিতে একটি বাঘ মারাও পড়েছিল।

দর্শনার্থী ও দোকানীর ভিড় ঠেলে আজ যারা শিলাইদহে রবিঠাকুরের কুঠিবাড়ি দেখতে যান তারা হয়তো বিশ্বাসই করবেন না যে ওখানে একদিন বাঘশিকার করা হয়েছিল। কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই; তখন বাংলাদেশের সবখানেই বাঘ ছিল। সে বাঘ হলো চিতাবাঘ। চিতাবাঘ মানে 'লেপার্ড'; 'টাইগার' নয়।

সেকালে চিতাবাঘ নামের সেই অতিকায় বিড়াল এ দেশের ঝোপঝাড়েও টিকে ছিল। শিয়াল, খাটাশ, গুইসাপ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী শিকার করে চিতাবাঘ জীবনধারণ করত। চিতাবাঘের কবলে মানুষ কমই মারা পড়েছে। তবে মাঝে মাঝে ওরা কৃষকের গরু-ছাগল অথবা গৃহস্থের পোষা-কুকুর বধ করত। সবাই তখন তার প্রতিবিধান করতে উঠেপড়ে লাগত। অর্ধভুক্ত লাশের কাছে মাচা বেঁধে বসে থেকে গাঁয়ের লোক রাতে ক্ষুধার্ত চিতাবাঘকে গুলি করে মারার চেষ্টা করত।

বাঘশিকারের সেই বাল্যস্মৃতি নিয়ে পরবর্তীকালে রবিঠাকুর কোন 'সাহিত্য' করেননি। বৃক্ষরোপণ নিয়ে তাঁর একাধিক কবিতা আছে; কিন্তু শিকারের প্রশস্তি কমই পাওয়া যায়। তার কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। একজন শিকারি আর পরিণত রবিঠাকুরের চরিত্রে মেলা ফারাক। তা ছাড়া শিকার নিয়ে সাহিত্যকর্ম করার দিনও তো তখন প্রায় শেষ।

*প্রকৃতি ও পাখি পর্যবেক্ষক

মানুষ আদিকাল থেকে বন্যপ্রাণীর সাথে লড়াইয়ের বীরত্বগাথা আর শোকগাথা লিখে আসছে। মানুষের আদিতম লিখিত সাহিত্যকর্ম 'গিলগামেশ উপাখ্যান' তেমনই এক বীরত্বগাথা যেখানে নায়ক উথনাপিশ্তিম খালিহাতে লড়াই করে একসাথে দুটি সিংহকে কাবু করেছে। সেটা ছিল যিশুর জন্মের দুই হাজার বছর আগের কাহিনী।

হিংস্রপ্রাণী ও মানুষের সংঘাতকে এক কালে যথার্থই 'লড়াই' আখ্যা দেওয়া যেত। মানুষের হাতে অস্ত্র ওঠার ক্ষণ থেকে ওই লড়াইয়ে হিংস্রপ্রাণীর পাল্লা হালকা হয়ে মানুষেরটা ভারী হয়েছে। লড়াইটা আরও অসম হয়েছে মানুষ যখন বল্লম, তীর আর পাথর দূরে ছুঁড়ে মারার কৌশল আয়ত্তে এনেছে।

তারপর, আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে মানুষের হাতে। তখন মানুষ ও হিংগ্রপ্রাণী মুখোমুখি হলে তাকে আর লড়াই আখ্যা দেওয়া যায়নি; তার নাম হয়েছে 'শিকার'। ইংরেজিতে এর নাম হয়েছে 'গেইম'; অর্থাৎ খেলা। 'খেলা' নামকরণটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নির্মম। কারণ, এই 'খেলায়' মানুষের প্রতিপক্ষ যে বন্যপ্রাণীটি তাকে তো বলাই হয় না যে খেলাটা শুরু হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বন্দুক নামক অস্ত্রটি সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে শিকার নিয়ে সাহিত্যকর্ম করায় ভাটা পড়ে গেছে। হিংস্রপ্রাণীর সামনে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ানো মানুষের চেয়ে বন্দুকের মুখে দাঁড়ানো বন্যপ্রাণীর মধ্যে বীরত্ব বেশি প্রকাশিত বলে মনে হয়েছে। শিকারিকে বাহবা দেওয়ার চেয়ে লোকে নিহত প্রাণীর জন্য শোকাতুর হতে শুরু করেছে।

হিংস্রপ্রাণীকে প্রতিরোধ করা, পরাজিত করা কিংবা বধ করাটা আজ আর বীরত্বের কাজ বলে গণ্য হয় না। বন্যপ্রাণী শিকার করাটা মূলত ধনী, আয়েসি অথবা বয়েসী মানুষের বিনোদনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। শিলাইদহে জ্যোতিদাদার বাঘশিকারটিও তো তেমনই একটি ঘটনা ছিল।

উনিশ শতকে অনেকেই সংহারের চেয়ে সংরক্ষণকে মূল্য দিতে শুরু করে। ওই শতকের প্রথমার্ধে দার্শনিক রাল্‌ফ অয়াল্ডো এমারসনের দুটি পুস্তক যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে পুরনো পৃথিবীতেও বড় রকমের প্রভাব ফেলেছিল। বই দুটির নাম 'নেচার' ও 'সেলফ রিলায়েন্স'। প্রকৃতির কাছে গিয়ে আর নিজের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মপ্রেমের উর্ধে ওঠার কথাই বলেছিলেন এমারসন।

এমারসনের সাহচর্যে ও লেখনিতে প্রভাবিত একজন তরুণ লেখক ম্যাসাচুসেট্‌স স্টেটের এক বনে দুই বছর একাকী বাস করার পর একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'ওয়াল্ডেন'। লেখকের নাম 'হেনরি ডেভিড থোরো'। বনে গিয়ে বৃক্ষতলে বাস করে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার কথা নতুন করে বললেন থোরো। ধ্রুবতারা হয়ে রইল তাঁর 'ওয়াল্ডেন' দুই শতক ধরে।

সেকোয়া-বন, ইয়েসোমিতি-বনাঞ্চল, গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরলেন এমারসন-প্রভাবিত আর এক প্রকৃতিপ্রেমী। তাঁর নাম 'জন মিয়র'। তাঁর লেখনী যেন জীবন্ত সেকোয়া গাছকে শহরের গৃহকোণে এনে তার শিকড় ও শাখা বিস্তারের সুযোগ করে দিল।

তারুণ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক এমারসন ও কবি হুইটম্যানের ভক্ত হয়েছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাশেষে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ড না পাঠিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে পড়তে পাঠিয়েছিলেন ১৯০৬ সালে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে একবার এবং পরে দু'বার তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরেও গিয়েছিলেন। প্রকৃতিপ্রেমী এমারসন, থোরো, মিয়র ও হুইটম্যানের সাথেই ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়তা।

আজও তাই রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমী আখ্যা দিতে দ্বিধা নেই কোনো কবিতা পাঠকের। তাঁর কবিতার অতি বড় অংশ জুড়ে বিকশিত হয়েছে প্রকৃতিপ্রেম। তিনি বলেন, 'আমি নদীর জলে থাকি রে কান পেতে, কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে'। তিনি আজীবন ছিলেন বৃক্ষের, বাদলের ও নদীর কবি।

বিশ শতককে আমরা সহজেই প্রকৃতিপ্রেম আর প্রকৃতি-সংরক্ষণ নিয়ে সাহিত্যকর্ম করার কাল বলে চিহ্নিত করতে পারি। এ শতকে শিকারের দিন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি ঠিকই; কিন্তু নিধন নিয়ে 'গিলগামেশ উপাখ্যান' লেখার কাল যে গত হয়েছে তা বলা যায়।

প্রকৃতি-সংরক্ষণ নিয়ে বিশ শতকের সেই মধুর ও প্রাণবন্ত ধারাটিই রবিঠাকুরের কবিমানসকে গতিশীল করেছিল। পাতার মর্মরেতে প্রাণ কাঁপে যে কবির, যিনি নদীর জলে কান পেতে থাকেন আর ফুলের ভাষা বুঝতে চান তাঁর জন্য বিগত শতাব্দীর সংহার ও সম্ভোগবাদী ধারায় নিমজ্জিত থাকা সম্ভব ছিল না।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'রক্তকরবী'। রক্তকরবীতে মহারাজা গেল নদীর প্রবাহ বন্ধ করতে; প্রজারা করল বিদ্রোহ; রাজপুত্র নিজে যোগ দিল সে বিদ্রোহে। নদীর পক্ষ নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের উঠে দাঁড়ানোর সাহস হলো। সংহারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ানোর কাল চলে এলো।

সন্দেহ নেই, শিকার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সংহারের উল্লাস আমাদের আদিম তাগিদ। তবুও আজকের বিশ্ব শিকারের চেয়ে সংরক্ষণ বেশি চায়। বন্দুকের চেয়ে বাইনোকুলার ও টেলিস্কোপ বেশি বিক্রি হয়। শিকারের চেয়ে সংরক্ষণ নিয়েই মানুষ বেশি লেখালেখি করে।

ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ছবি :
১ চিতাবাঘ
২ শান্তিনিকেতনের শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর আঁকা বৃক্ষ
৩ রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি

ভোঁদড়ের ধ্রুপদী নৃত্য

শরীফ খান*

খুলনা থেকে লঞ্চ ছাড়ল সন্ধ্যা ৬টায়। গন্তব্য বাগেরহাটের মোল্লাহাট। ওখানেই আমার বাবার অফিস বা কর্মস্থল। এবার সঙ্গী আমি। মোল্লাহাটে থাকব কদিন। বেড়াব। পাখি শিকার করবেন বাবা, আমি পাখি কুড়াব। মধুমতি নদীর দক্ষিণপাড়ে মোল্লাহাট, উত্তরপাড়ে গোপালগঞ্জের সীমানা। গত শীতেও আমি এসেছিলাম। শীতের পাখির বড় বড় ঝাঁক দেখেছিলাম। অনেক পাখি শিকার করে মাংস জ্বালিয়ে মাটির হাঁড়িতে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। এখন অবশ্য হেমন্তকাল। তা-ও পাওয়া যাবে নানান প্রজাতির পাখি।

সুন্দরবনে ভোঁদড়, ছবি: মনিরুল এইচ খান

*প্রকৃতি ও পাখি গবেষক

সুন্দরবনে ভোঁদড়, ছবি: আ ন ম আমিনুর রহমান

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল বাবার ধাক্কাধাক্কি ও ডাকাডাকিতে। উঠলাম। ছোট লঞ্চের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম বাবার পাশে। উনি আমাকে শুশুক দেখাচ্ছেন। ঘন ঘন জলের উপরে 'ভুস' শব্দে উঠে আবারো অদৃশ্য হচ্ছে জলের তলায়। দেখছেন আরো অনেক যাত্রী। মোল্লাহাট তখনো কতদূর, জানি না আমি। আমাকে পেয়েছে শুশুক– বাগেরহাট-খুলনায় পরিচিত যেটি 'শোশ' নামে, সেটি দেখার নেশায়। প্রতি মিনিটে ২-৫টি শুশুক দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ-ই পেছন থেকে কিছু লোক উৎসাহিত হয়ে ডাকলেন আমার বাবাকে– বাবার কাঁধে ঝোলানো খাকি কাপড়ের তৈরি বন্দুকের কভার– একেবারে বন্দুকের মাপে বানানো, পেছনের ওরা কি কোনো বড় পাখি দেখলেন নদীর পাড়ে! মদনটাক! মানিকজোড়! সাদা মানিকজোড়! না, পাখি-টাখি কিছু নয়, নদীর দক্ষিণ পাড়ের ঘন গ্রামীণ বনটা থেকে জলকাদার একটা ফুট তিনেক চওড়া ভেজা ঢালু জায়গা ধরে ৪টি বড় ভোঁদড় ও ৮টি বাচ্চা স্লিপ খেয়ে নদীর জলে নামছে কাত-চিৎ হয়ে। কেন জানি বাবা আমার বন্দুকটা বের করলেন– ওগুলোকে গুলি করার জন্য! ওগুলো মেতেছে মজার খেলায়। এখনকার শিশু পার্কের স্লিপারে উঠে ছোট ছেলেমেয়েরা– এমনকি বড়রাও দু'পা নিচের দিকে টানটান করে রেখে বসা অবস্থায় 'সুড়ুৎ' করে নামে, ভোঁদড়গুলোও যেন প্রাকৃতিক স্লিপার ধরে ওভাবে নামছে জলে। এই 'স্লিপার' ভোঁদড়রা নিজেরাই তৈরি করে নেয় নদীতে নামার সুবিধার জন্য, খেলার জন্য। ভেজা শরীর নিয়ে ৪/৫টি ভোঁদড় বারবার ডাঙায় ওঠে ও নামে– ইচ্ছে করেই, যাতে খাড়া পাড়টা ভিজে পিচ্ছিল তেলতেলে হয়– অনেক সময় এই জলভেজা পথটা ওরা টেনে নেয় নিজেদের আশ্রয়স্থল পর্যন্ত। নিজেদের সুবিধা ওরা ভালোই বোঝে। যা হোক, লঞ্চের ছাদের লোকজনের অনুরোধে বাবা তার বীরত্ব ফলালেন– লঞ্চ তো তখন বেশ এগিয়েছে, বাবা কিছুটা অ্যাঙ্গেলে গুলি করলেন, একটি বয়সী ভোঁদড় খাড়া লাফ দিয়ে স্লিপারের মাঝখানে পড়েই যেন নাচতে শুরু করল– কোমরে লেগেছে গুলি, ওটা তখন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, দৌড়াতে চেষ্টা করছে বাগানটার দিকে। স্লিপ খেয়ে নিচের দিকে নামছে, ওটা চেষ্টা করছে উপরের দিকে যেতে। এই যে খাড়া নামছে, শরীরে পাক খাওয়াচ্ছে, উঠছে-পড়ছে ও ঘুরছে– এটাকে বলা হয় ভোঁদড় নৃত্য। দারুণ উপভোগ্য ধ্রুপদী নৃত্য এটা– নৃত্যমুদ্রার সবগুলো 'কলা'ই দেখায় ভোঁদড়রা এরকম ক্ষেত্রে। সবাই মজা দেখছে, ভোঁদড়টার তো জীবন যায় যায়! নাচতে নাচতেই ওটা স্লিপ খেয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ল মধুমতির জলে, লঞ্চও দূরে এল, একটু যেন বাঁক, অদৃশ্য হয়ে গেল ভেসে যাওয়া ভোঁদড়টি।

পরবর্তী জীবনে কোমরে গুলি খাওয়ার পরে শিয়াল-খাটাস ও বনবিড়ালের নৃত্যও আমি দেখেছি। তবে, নৃত্যমুদ্রায় ভোঁদড়ই সেরা। ভোঁদড়ের নাচ নিয়ে তাই তো ছড়াকাররা লিখেছেন নানান রকম ছড়া। প্রসঙ্গত এখানে বলতে হয় যে, বর্তমানে মোল্লাহাট থেকে ফকিরহাট পর্যন্ত মোটরসাইকেলে যেতে সর্বোচ্চ সময় লাগবে ২৫/৩০ মিনিট। কিন্তু সেই ১৯৬৭ সালে গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া-খুলনার তেরখাদা-মোল্লাহাট-চিতলমারী ও ফকিরহাটে যাতায়াতের জন্য কোনোই পথঘাট ছিল না– ছিল অনেকগুলো বিলের সমন্বয়ে বিশাল হাওর। চিত্রা-বলেশ্বর নদী। তাই তো ফকিরহাট থেকে ট্রেনে রূপসা হয়ে খুলনায় গিয়ে লঞ্চে চড়ে মোল্লাহাটে যাতায়াত করতেন বাবা। বন্দুক তখন ব্যাপারই ছিল না। যেখানে বাবার অফিস, সেখানেই তিনি বন্দুকটা নিয়ে যেতেন (ইংল্যাণ্ডে তৈরি) শরণখোলা-মোরেলগঞ্জ-সাতক্ষীরা-চালনা (মোংলা)সহ আরো কত থানা! বন্যপ্রাণী আইন কি তখন ছিল! আমার তো মনে হয় না। বাবা অকারণে কেন গুলি করলেন ভোঁদড়টাকে!

মোল্লাহাটের ভোঁদড়নৃত্য দেখার আগে ১৯৬৪ সালে ওই খুলনা থেকেই সকালে লঞ্চে চড়ে মধুমতি নদী ধরে গোপালগঞ্জের 'জলিলপাড়'-এ গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওখানে চাকরি করতেন আমার বড় খালু। খালাও থাকতেন কোয়ার্টারে। আমার সদ্য বিবাহিত মামা ও মামি যাচ্ছেন বড় খালার ওখানে বেড়াতে, সঙ্গী আমি ও আমার বড় খালার ছেলে আলম–– মো. খুরশিদ আলম (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব), সমবয়সী দু মানিকজোড় ভাগ্নেকে ফেলে বড় মামা কীভাবে যাবেন তার বড় বোনের ওখানে বেড়াতে! তো দীর্ঘ লঞ্চ যাত্রায় সেবার আমরা (ফিরতি দিনসহ) মধুমতির জলে প্রতি মিনিটে গড়ে ২টি করে শুশুক যেমন দেখেছিলাম– দেখেছিলাম দু-পাঁচ জায়গার ভোঁদড়ের স্লিপিং-গেমের জায়গা ও ওদের মজার খেলা।

মাছ খাচ্ছে ভোঁদড়, ছবি: মনিরুল এইচ খান

ভোঁদড়! ওরা তো আমার শৈশব-কৈশোরে আমাদেরই পুকুর পাড়ের দক্ষিণ পাশের ঘন জঙ্গলেই ছিল। ওখানে ছিল বিশাল লম্বা ও মোটা একটি বয়সী হিজল গাছ। ওই গাছটার পাশেই ছিল বিশাল একটা আমগাছ। হিজলের শেকড়ের তলায় ছিল প্রাকৃতিক গর্ত বা সুড়ঙ্গ। আমগাছটার গোড়ার এক পাশের বাকল যেভাবেই হোক ভেঙে গিয়েছিল– ভেতরের যে ফাঁপা স্থানটা ছিল– ওখানে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষও সোজা হয়ে যেমন দাঁড়াতে পারত, তেমনি পারত হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে শুয়ে থাকতে। ভোঁদড়দের আশ্রয়স্থল ছিল ওখানেই।

ওখানটায় আমাদের পারিবারিক কবরস্থান। বড় বড় গাছ। ঝোপঝাড়। বিনা প্রয়োজনে কেউ মাড়াত না ওদিকটায়। ওই স্থান থেকে আশপাশের গেরস্থবাড়ির আরো ৫টি পুকুরে ছিল ভোঁদড়দের অবাধ যাতায়াত। আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তো মাঠঘাট, খালবিলে জল থাকত, তখন ওরা ওসব জায়গায়ও মাছ খেতে যেত দলবেঁধে। আমাদের বাড়ির পুব পাশের সরকারি বিশাল দিঘিটায়ও নামত ওরা রাতে। ঘরে শুয়েই সন্ধ্যা ও রাতে কুকুরের হাঁকডাক যেমন শোনা যেত, তেমনি জলে দাপাদাপি-ঝাঁপাঝাঁপির নানান রকম শব্দ ও ভোঁদড়দের ডাক শোনা যেত।

জীবনের প্রথম ভোঁদড়-নৃত্য আমাকে বাবাই দেখিয়েছিলেন, আমাদের পুকুর পাড়েই। মাছ খেয়ে শেষ করছে ভোঁদড়ে, অতএব পুকুরের এ পাড়ে বন্দুক হাতে বাবা প্রস্তুত, তিন সেলের টর্চ আমার হাতে। কবরস্থানের বাগান থেকে ওদেরই তৈরি 'স্লিপার' ধরে জলে নেমে যখন হুটোপুটি-হুড়োহুড়ি, বাবা হাত দিয়ে আমার পিঠে আলতো চাপ দিলেন, আমি টর্চের বোতাম টিপে দিলাম, দেখি– জোনাকির আলোর জ্বলা-নেভার মতো জলে নামা প্রাণীগুলোর চোখ জ্বলছে, সবগুলো জলে– দেখছে আমাদেরকে কুঁতকুতে চোখে, সন্দেহভরা চোখে, একটু বাদেই সবগুলো জল থেকে উঠে স্লিপার ধরে যখন পড়িমরি দৌড় লাগিয়েছে, তখনই গুলির শব্দ। দুটির কোমরে লাগতেই শুরু হলো ভোঁদড়-নৃত্য, বলা যায় দ্বৈত নাচ– ব্যালে নৃত্যও বলা যায়। দ্বিতীয় গুলিতে প্রাণী দুটিই স্লিপার বেয়ে নেমে জলে পড়ল। এখানে বলতে চাই যে, কৌতূহলী আমি পরবর্তীতে (এখনো) বহু বয়সী মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি– শুনেছি তাদের অভিজ্ঞতার কথা। চার প্রজন্মের (যেমন তাঁদের দাদা, তাঁদের দাদারা– তাঁদেরও বাবা-দাদাদের কাছে শোনা অভিজ্ঞতা তাঁরা আমাকে শুনিয়েছেন, আমি নিজেও তো আমার পূর্ববর্তী চার-পাঁচ প্রজন্মের তথ্য জেনেছি– নিজেও বাল্য-কৈশোরে ভোঁদড় দেখেছি, সব মিলে আমার ব্যক্তিগত তথ্যভাণ্ডারটা মোটামুটি ভারি)।

ভোঁদড়রা মূলত নিশাচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। দিনে থাকে বড় বড় বাগানের বড় বড় গাছের বিশাল বিশাল কোটরে, বিশেষ করে বট-পাকুড় ও অশ্বত্থ গাছ বেশি পছন্দ। এরকম আশ্রয়স্থল আমার গ্রামে বেশ কটি ছিল। খুলনা-বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ইটের পাঁজার ভেতরেও থাকত। বিল-জলাশয়-নদী-খাল-হাওর-বাঁওড়-পুকুর-দিঘিসহ জলাভূমির পাশেই বসবাস এদের। সন্ধ্যার পরে চারণক্ষেত্রে নামে। দক্ষ সাঁতারু, ওস্তাদ ডাইভার ও জলের তলায় চলাচল করে টর্পেডোর মতো, এক ডুবে প্রয়োজনে অনেকক্ষণ পানির তলায় থাকতে পারে। যদিও এদের নখরগুলো বরই কাঁটার মতো ছোট, তবে পায়ের তলায় কি 'আইকা' বা সুপারগ্লু জাতীয় কোনো পদার্থ থাকে, যাতে একাধিক মাছ ধরে ডাঙায় উঠে যখন খায়, তখন মুখের মাছটি বাদে অন্য মাছ (এক বা একাধিক) লাফায় ও পালাতে চায়, তখন অন্য থাবা দিয়ে ওগুলোকে সামলায় কীভাবে? আমি জানি না। জানার ইচ্ছে হলেও জানতে পারিনি– ওদের শরীরের বমি উদ্রেককারী বোঁটকা দুর্গন্ধের জন্য। হয়তো বা একই কারণে পোষা কুকুররা ওদের ধারেকাছেও যায় না– আক্রমণের চেষ্টাও করে না। পিচ্ছিল-তেলতেলে শরীর ওদের, মাছ শিকারে মহা ওস্তাদ। ওদের ধাওয়ায় শোল-টাকি-ট্যাংরা-কইসহ রুই-কাতলা মাছকে লাফ দিয়ে ডাঙায় পড়তে (ইচ্ছে করে পড়েনি, বেহুঁশের মতো প্রাণভয়ে লাফ দিয়েছে তো!) দেখেছি। একরোখা-দুঃসাহসী ও দুরন্ত ভোঁদড়রা অকারণে সামনে পড়া যে কোনো ধরনের সাপকে পরিকল্পিত ও কুশলী আক্রমণে মেরে ফেলে। গুইসাপকে ধাওয়া দেয়। অবসরে ছানাদের সঙ্গে খেলায় মাতে। স্লিপারে খেলতে ছানারা খুবই ভালোবাসে। আবার, জলাশয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া গাছ বেয়ে ওঠে– জলে ঝাঁপ দেয় বারবার। মানব শিশুরাও ভালোবাসে এরকম খেলা।

শীতকালে পুকুর-দিঘি-বিল-ঝিলে হাত দিয়ে অনেকেই ভালো মাছ ধরতে পারতেন। পায়ের তলায় মাছ– বিশেষ করে ভ্যাদা মাছ বা রয়না মাছ পড়লে ডুব দিয়ে তা ধরা হতো। এরকমভাবে যারা হাত দিয়ে মাছ ধরায় খুবই দক্ষ ছিল, তাদের খেতাব জুটত 'ভোঁদড়' হিসেবে। বাগেরহাটে ভোঁদড় পরিচিত ছিল 'ধাঁইড়ে' নামে। খেতাবপ্রাপ্তরা পরিচিত হতেন 'ধাঁইড়ে তালেব', 'ধাঁইড়ে হাকিম' ইত্যাদি নামে। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় এক হাটবারে আমার ছোট নানা হাট থেকে ফিরেই বাড়ির 'টিম টুয়েলভ'-এর সদস্যদের ডেকে (এক বাড়িতে সমবয়সী ছেলেমেয়ে ছিলাম ১২জন) নিয়ে গেলেন গ্রামের 'তেলিকান্দির বিলে'। চাঁদনি রাত, হেমন্তকাল, যে কোনো কারণেই হোক, একটু নিচু জায়গার জলে ২০-২৫টা ভোঁদড় মহাউৎসবে মাছ খাবার হুড়োহুড়িতে মেতেছে, জলে শব্দ, ওদের লুটোপুটি-কাড়াকাড়ি ও ডাকাডাকিসহ মাছ নিয়ে মারামারি। জল কমে আসছে শীতের টানে। বিলের মাছ তাই বোধ হয় জড়ো হয়েছিল ওখানে। নানা হাট থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় দেখে গেছেন এই 'ভোঁদড়-উৎসব', তাই ডেকে এনেছেন আমাদের। ওই 'ভোঁদড়-উৎসব' আজো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাবার সঙ্গে 'উত্তরের হাওরে' গিয়ে পাখি শিকারের সময়ে বিলের জলে, খালে ও চিত্রা নদীর জল থেকে জেলেদের দেখেছি ভোঁদড় দিয়ে 'তাড়া' করিয়ে মাছ জালে ফেলতে। বাগেরহাটের বারুইপাড়া ইউনিয়নের 'কুরশাল' গ্রামে এরকম জেলেদের বাস ছিল তখন। ভোঁদড়ের গলায় থাকত হাতের বালার মাপের মোটা বালা– যার নাম ছিল 'বয়লা'। বয়লার সঙ্গে বাঁধা থাকত দড়ি। যাতে দড়ির টানে ভোঁদড়ের গলায় ফাঁস না লাগে, তাই এই বয়লা। বাগেরহাটে তখন 'ভোঁদড় শিকারি' জেলে বেশকিছু ছিল। ১৯৮০ সাল পর্যন্তও ২-১ জন জেলে ২-১টি ভোঁদড় নৌকায় রাখতেন। এখন শিকারি ভোঁদড় তো দূরের কথা– ভোঁদড়ই বিলুপ্ত গ্রামবাংলা থেকে। কারণ নানাবিধ, জটিল-কঠিন ও সমাধানযোগ্য নয়।

হায়রে ভোঁদড়! হায়রে ধাঁইড়ে! আমরা যা দেখলাম একেবারে হাতের নাগালে, ৬০ বছরে তা নেই হয়ে গেল! সুন্দরবন লাগোয়া জেলাগুলো থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন শুধু সুন্দরবনে! আর টিকে আছে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জলাভূমিগুলোতে। সিলেটেও থাকতে পারে।

ভোঁদড়রা উদবিড়াল, ধাঁইড়া, ধাঁইড়ে, ধেঁড়ে ইত্যাদি নামে পরিচিত। ইংরেজি নাম Oriental small-clawed otter। বৈজ্ঞানিক নাম Aonyx cinerea। মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৪১ সেন্টিমিটার। শুধুমাত্র লেজটি ২৯ সেন্টিমিটার। তবে দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬১ সেমি ও লেজটি ৩৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই ভোঁদড়টি সবচেয়ে ছোট। ওজন ২.৭ থেকে ৫.৪ কেজি। মূল খাবার নানান রকম মাছ-কাঁকড়া-ঝিনুক ও শামুক (খোলা ভেঙে ভেতরের মাংস খায়) তুখোড় শিকারি, তাই আজো সুন্দরবনে কিছু 'শিকারি ভোঁদড়' নিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। এগুলো আসে নড়াইল জেলা থেকে। ক্বচিৎ মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভোঁদড় শিকার করত আমাদের শৈশব-কৈশোরে। আমরাই 'ভোঁদড়ের আখড়া' দেখিয়ে দিতাম তাদের–– শিকার দৃশ্য দেখার জন্য। ভোঁদড়ের চামড়া নাকি বেশ মূল্যবান। তা নাহলে ২০০৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারিতে ২৩টি ভোঁদড়ের চামড়া আটকেছিল কেন বনবিভাগ? খুলনার কয়রা উপজেলার সুন্দরবনের কাশিয়াবাদ স্টেশনের বন কর্মকর্তারা ২৩টি ভোঁদড়ের চামড়াসহ আকবর আলীসহ মোট ৩জন চোরাকারবারিকে আটক করেছিলেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন–– বিদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মোট মূল্য নাকি দু'লক্ষ টাকা হবে। যে প্রাণীগুলো বিপদের আভাস বা গন্ধ পেলে পেছনের দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে চারপাশটা পর্যবেক্ষণ করে সতর্কভাবে, অবসরে সবাই মিলে ঘাস-মাটিতে আনন্দদায়ক খেলায় মাতে গড়াগড়ি-জড়াজড়ি করে, সেই মজার প্রাণীটা যেন হারিয়ে না যায় বাংলাদেশ থেকে।

ভোঁদড়রা তুখোড় প্রেমিক-প্রেমিকাও। এরা একগামী ও সারা জীবনের জন্য জোড় বাঁধে। এদের গর্ভধারণকাল ৬০-৬৪ দিন। বছরে দুবার ছানা তোলে। প্রতি প্রসবে ১-৬টি ছানা হয়। আয়ুষ্কাল ১০-১৬ বছর। বিরল-বিপন্ন এই প্রাণীগুলো টিকে থাক আরো বহুকাল। চ্যাপ্টা লেজ দিয়ে জলের তলায় পানি ঠেলে ঠেলে নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর সাঁতার কাটুক আরো বহু বহু বছর। জলের তলায় চ্যাপ্টা লেজের চাবুক কষে ওরা মাছকে কুপোকাত করে বলে শুনেছি আমি বহু জেলের মুখে। নিজেদের ভেতর ক্বচিৎ ঝগড়াঝাটি-মারামারি লাগলেও 'লেজ-চাবুক' দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে।

বাঘের চোখ

মনিরুল খান*

বাঘের চোখের দিকে তাকিয়েছেন কখনো? হোক না সে বনের বাঘ কিংবা চিড়িয়াখানার। একবার তাকিয়ে দেখুন ঐ সোনালী চোখের আগুন। প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে বনের রাজা হিসেবে। বাজার মত সে বহুকাল রাজত্ব করেছে এশিয়ার বনে-জঙ্গলে–মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত, সাইবেরিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত। এরপর সে হারতে থাকে অন্য এক প্রাণীর কাছে, পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে তার রাজত্ব। বাঘের প্রতিদ্বন্দী যে প্রাণী সে শক্তি-সাহসে নয়, বুদ্ধি আর আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে বলীয়ান অথবা টাকার জোরে বলীয়ান, সে মানুষ। প্রবাদ আছে, টাকা থাকলে বাঘের চোখ মেলে"। শুধু চোখ নয়, চামড়া-দাঁত-নখ-লিঙ্গ সবই মেলে। মেলেনা শুধু প্রাণ - মৃত প্রাণীকে জীবিত করা যায় না, বিলুপ্ত প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তথাপি বাঘসহ অপরাপর বিপন্ন বন্যপ্রানির ওপর মানুষের অত্যচার থামে না। থামবে কী করে, মানুষ তো সৃষ্টির 'সেরা"! বাঘের মত একটি রাজকীয় প্রাণী হারিয়ে গেলে প্রকৃতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পৃথিবী কতটা দারিদ্র হয় সেটি ভেবে দেখার সময় কোথায়?

ছোটবেলায় আমার বাবা সাদত আলী খান এর মুখে যতটা স্মৃতিচারণ শুনেছি তার মধ্যে সরচেয়ে উজ্জ্বল হলো ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়কালে মধুপুরে গড়ে কয়েকবার বুনো বাঘের মুখোমুখি হওয়া। কেউ যদি প্রশ্ন করে আমার পিএইচডি ফিল্ডওয়ার্কের সময় কয়েকবার বুনো বাঘের চোখে চোখ রেখে তাকানোর কথা। এই অভিজ্ঞতা বলে বোঝানো যাবে না, টাকা দিয়ে কেনা যাবে না। আর সেখানেই বাঘের মহিমা বাঘ অমূল্য। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি আমার বাবার মত করে অথবা আমার মত করে বুনো বাঘ দেখে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পাবে?

বাঘের চোখে চোখ রাখার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল সুন্দরবনের কটকা এলাকায়। সেটি ছিল সুন্দরবনে আমার দেখা সরচেয়ে বড় পুরুষ বাঘ বা বাঘী। সুন্দরবনে পিএইচডি ফিল্ডওয়ার্কের প্রথম দিককার কথা। যে সময়ের কথা বলছি তখন ডিএসএলআর ক্যামেরা

*অধ্যাপক ও সভাপতি প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

তেমন উন্নত ছিল না, কিন্তু দাম ছিল অনেক বেশি। তাই তখন বন্যপ্রাণীর ছবি তোলার জন্য আমি নিকন এসএলআর ক্যামেরা ও ৩০০ মিলিমিটার প্রাইম লেন্স ব্যবহার করতাম, সাথে স্লাইড রোল। আমি আর আমার তিন সহকারী বিকেল বেলা, কটকা টাওয়ারের বেশ কিছুটা উত্তরদিকে জামতলার মাঠে বাঘের চিহ্ন খুজে বেড়াচ্ছি। প্রথমে নরম মাটিতে বাঘের বড় বড় কিছু পায়ের ছাঁপ খুজে পাই। পরক্ষণেই মাথা তুলে বেশ কিছুটা দূরে হাল্কাভাবে গজিয়ে ওঠা শনের ভেতর দিয়ে হেটে যেতে দেখি প্রকান্ড বাঘটিকে। বাঘটি মাথা নিচু করে হেটে যাচ্ছে, মনে হল যে কিছু ভাবছে। আমরা সন্তর্পণে তার পিছু নিলাম। একটু পর পর থামছি তার ছবি তোলার জন্য, কিন্তু পিছন দিক থেকে তেমন ভাল ছবি তোলা পাচ্ছি না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা বাঘের বেশ কাছে চলে এলাম, যদিও বাঘটি তখনও আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি। শনের মাঠের শেষ প্রান্তে এসে বাঘটি বাঁয়ে ঘুরে গেল ঘন বনে ঢুকে যাবে বলে। ক্যামেরার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি স্লাইড রোল শেষ পর্যায়ে (এক রোল ৩৬ টি ছবি তোলা যেতো), বাঘ দেখার উত্তেজনায় সেটি আমি খেয়াল করিনি। আর একটি মাত্র ছবি তোলা যাবে। বাঘের চেহারাসহ ভাল একটি ছবি পাওয়ার জন্য সেই সময় এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলাম। বাঘের দিকে ক্যামেরা তাক করে লেন্স ফোকাস করে জোরে শিস দিলাম। শব্দ শুনে বাঘটি মাথা উচুঁ করে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, আমিও যথাসময়ে ক্যামেরার শাটার চাপলাম। আর ছবি তোলার সুযোগ ছিল না, তাই ক্যামেরা নামিয়ে বাঘের চোখে চোখ রাখলাম। বাপ রে, সে কী উত্তেজনাকর মুহূর্ত ! বনের মাঝখানে খোলা জায়গায় বাঘ আর আমি একে অপরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছি। যেখানে দাড়িয়ে আছি সেটি ঐ পুরুষ বাঘের রাজ্য। রাজার মতই রাজকীয় তার সোনালী চোখের চাহনি। চোখ দুটো বড় বড় করে বাঘটি আমাকে দেখল তারপর ধুপধাড় শব্দ তুলে কয়েকটি বড় বড় লাফ দিয়ে বনের ভেতর ঢুকে গেল। এই স্মৃতি কোনদিন ভোলার নয়।

আরেকবার এক তরুন বাঘের চোখে চোখ রেখেছিলাম খুব কাছে থেকে। বাঘটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে হয়তো অতটা কাছে যেতাম না। ঘটনাস্থল সুন্দরবনের সুপতি এলাকা। ওখানে সাপের খাল নামের সরু ও আকাবাঁকা একটি খাল বনের ভেতর ঢুকেছে। পড়ন্ত বিকেলে আমরা ডিঙ্গি নৌকায় করে খাল থেকে বেরিয়ে আসছি। একটি জায়গায় খালের বাঁক ঘোরার পর সামনে তাকিয়ে দেখি খালের পাড়ে একদম পানির

ধারেবসে আছে একটি তরুন বাঘ। হয়তো মাছ শিকারের অপেক্ষায় আছে। আমাদের দেখেই সে উঠে গেল উপরে, হারিয়ে গেল ঘন সুন্দরী গাছের বনে। ওখানে প্রকান্ড সরু সুন্দরী গাছ, আর বড় গাছগুলোর নিচ দিয়ে ঘন হয়ে যায়নি বরং পাড়ের উপর সুন্দরী গাছের চারার ঘন ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করে খুজছে আমাদের। মাত্র ছয় মিটার বা তারও কম দূরত্বে বাঘের আর আমার চোখাচোখি। বাঘটির কৌতুহল ভরা চাহনি দেখে মনে হলো সে জীবনে প্রথম মানুষ দেখছে। তার চোখে চোখ রেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো আমার। এক ধরনের গভীর মায়া জন্মাল বাঘের প্রতি। এই নিবিড় যোগাযোগ বাঘ সংরক্ষণে আমার ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করেছে। পরবর্তীতে অবসর সময়ে অনেকবার আমি এই বাঘের কথা স্মরণ করেছি আর হিসেব করেছি বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স কত হয়েছে। এখনও বাঘটির কথা স্মরণ করি। বেঁচে থাকলে এখন সে জীবন সায়াহ্নে। এই বাঘটির ছবি আমার লেখা "টাইগারস ইন দ্য ম্যানগ্রুভস" বই এর প্রচ্ছদসহ আরও অনেক জায়গায় ছাপা হয়েছে। সম্প্রতি এটির ছবি দিয়ে একটি গেঞ্জির ডিজাইন করা হয়েছে।

বাঘের চোখের রং সোনালী হলেও রাতেরবেলা এর চোখে আলো পড়লে নীলচে দেখায়। হরিণের চোখও রাতের বেলা নীলচে দেখায়, তবে বাঘের চোখ হরিণের চোখের তুলানায় বড় এবং বেশি উজ্জ্বল । সুন্দরবনে কাজ করার সময় একবার আমি রাতেরবেলা বাঘের সেই নীলচে চাইনি দেখেছিলাম। তখন সন্ধ্যা সাতটার মত বাজে, তবে শীতকাল বিধায় পুরোপুরি আঁধার নেমে এসেছে সুন্দরবনে। আমাদের লঞ্চ কচিখালী খালের ভেতর নোঙ্গর করা। হঠাৎ লঞ্চের পিছন দিকে খালের কাঁদায় একটি বড় প্রাণী নামার এবং হেটে যাওয়ার চটাস-চটাস শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দের ধরনে আমি প্রায় নিশ্চিত এটি বাঘ। লঞ্চের ভেতর গিয়ে ব্যাগ হাতড়ে বড় টর্চলাইট নিয়ে বের হতে হতে একটু সময় লেগে গেল। টর্চের আলো জ্বেলে কোন প্রাণী খুঁজে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর খালের কাঁদায় আবার একই রকম শব্দ পেয়ে দ্রুত টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। খালের পাড় বরাবর টর্চের আলো ফেলতেই একটু দুওে জ্বলজ্বল কওে উঠল এক জোড়া সোনালী চোখ, তাকিয়ে আছে ঠিক আমাদের দিকে। দূবত্বের কারণে তার শরীরের অবয়টা হাল্কা দেখা যাচ্ছে। পরদিন সকালে খালের পাড়ে বাঘের পায়ের ছাঁপা পর্যবেক্ষণ করে বুঝলাম রাতেরবেলা দুটো বাঘ খাল পাড়ী হয়েছে যাদের মধ্যে প্রথমটিকে দেখতে না পারলেও দ্বিতীয়টিকে দেখেছি। বাঘ এমন সন্ধ্যা রাতে আর শেষ-রাতে বেশি চলাফেরা করে আর শিকার ধরে।

অনেক মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে বাঘ বাংলাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেলে কী এমন ক্ষতি ? অনেক দেশে তো বুনো বাঘ নেই, তাদের তো কোন সমস্যা হচ্ছে না! শুধু আমাদের জাতীয় প্রাণী বলে নয়, অনেক দেশে বাঘ নেই বলেই কিন্তু আমরা একে নিয়ে গর্বিত, বিশ্বের দরবারে আমরা এবং আমাদের ক্রিকেট টিম বাঘের পরিচয়ে পরিচিত। বাঘ সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্বও তাই অনেক বেশি। উল্লেখ্য, যে সব দেশে বুনো বাঘ নেই সেই সব দেশে অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী আছে যেগুলো সংরক্ষণে তারা সচেষ্ট আছে। সুন্দরবনের খাদ্যশৃংখলে বাঘের অবস্থান সবার উপরে, তাই বাঘের অনুপস্থিতিতে পুরো প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। বাঘ আছে বলে সুন্দরবনে অনেক দেশী-বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ণে ভূমিকা রাখে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। বাঘের ভয়ে সুন্দরবনে মানুষের অবাধ আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সীমিত থাকে। বাঘ আমাদেও পরিচয়। সে যেন হারিয়ে না যায়, চোখের পলকে।

প্লাস্টিকে গিলছে পরিবেশ

মুকিত মজুমদার বাবু*

প্রকৃতির ছায়ার মায়ায় আমরা বাঁধা, মা-সন্তানের নাড়ির সম্পর্কের মতো। প্রকৃতি আমাদের নিঃস্বার্থভাবে অন্ন দেয়, বস্ত্র দেয়, বাসস্থান দেয়, রোগে ওষুধ দেয়, বেঁচে থাকার অক্সিজেন দেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃতি আমাদের দেখভাল করে। ভালোবেসে আগলে রাখে। এক কথায়– প্রকৃতি আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যে প্রকৃতি মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে আমরা তিল তিল করে বেড়ে উঠছি, নাড়ি ছেঁড়ার পরই অচেনা হয়ে যায় সেই গর্ভধারিণী। বিভিন্ন দূষণে রক্তাক্ত করি মা রূপী প্রকৃতির কলেবর। প্রকৃতির গায়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে উপশমের জন্য আহাজারি করে। আমরা সে আহাজারি কানে শুনতে পাই না। চারপাশে তাকালে দেখতে পাই– ইটভাটা, কল-কারখানা, ধুলিকণা, গাড়ির কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। বরফ গলে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকিছু হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে উপকূলের মানুষ। নদী দূষণের পাশাপাশি দখল ও ভরাট চলছে। অপরিকল্পিত বাঁধ, ব্রিজ নির্মাণসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে মরে যাচ্ছে নদী। নদী হয়ে উঠছে বর্জ্যের ভাগাড়। বুড়িগঙ্গা তার বড় উদাহরণ। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বিপর্যয় নেমে আসছে। নগরায়ণের ফলে বনের পর বন উজাড় হচ্ছে। বন্যপ্রাণী কোণঠাসা হয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। জীবনযাপনে শব্দ শ্রুতিমধুর না হয়ে বিদীর্ণ করছে কানের অলিগলি। অধিকাংশই বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে উঠছে শহরে। শহরতলীগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে অপরিকল্পিত দালান-কোঠা। পরিবেশবান্ধব আবাসনের কথা বলে গড়ে উঠছে কংক্রিটের জঙ্গল। আবার আবাসনের নামে আবাদি জমি গিলে খাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা। কৃষকের ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কৃষকের উর্বরা ফসলি মাঠ বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। নানাবিধ দূষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ, ঠিক যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

প্লাস্টিক হলো এমন এক ধরনের পদার্থ যা পচনশীল নয়, মাটি কিংবা পানিতে মেশে না। একে তাই 'অপচ্য পদার্থ' হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। পরিবেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। উদ্ভিদরাজি, জলজপ্রাণী, মানুষ প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য উদ্ভিদ, জলজপ্রাণীর বাসস্থান ও খাদ্য সংগ্রহে বাধার সৃষ্টি করছে। মানুষের ক্ষেত্রে থাইরয়েড হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণসহ অন্যান্য কঠিন অসুখের জন্য প্লাস্টিক দূষণই দায়ী। প্লাস্টিকের ব্যাগ, গৃহস্থালির প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশিরভাগই পুনঃব্যবহার করা যায় না। এগুলো পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক দূষণ ঘটাচ্ছে।

শহরে কিংবা গ্রামে– আজ সব জায়গাতেই প্লাস্টিকের আগ্রাসন। বড় বড় শপিং মল থেকে শুরু করে কাঁচাবাজার, বইয়ের দোকান, ওষুধের দোকান, খাবারের দোকান, মুদির দোকান, ফলের দোকান, বাসাবাড়ি, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, শাড়ির দোকান, কৃষকের ফসলি জমি, নর্দমা কোথায় নেই প্লাস্টিক! প্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়ছে নদ-নদী-সাগরে। সাধারণ প্লাস্টিক ব্যাগের কথাই ধরা যাক– শহরের কেউ বাজারে গেলে একগাদা ছোট-বড়-মাঝারি প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে বাসায় ফেরেন। কেউ কেউ প্লাস্টিক ব্যাগ তুচ্ছ মনে করে ঘরের জানালা বা দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দেন। কেউ পথে চলতে চলতে বিভিন্ন খাবার খেয়ে রাস্তাতেই ফেলে দেন প্লাস্টিকের ব্যাগ। আবার কেউ কেউ দোকান থেকে প্লাস্টিক ব্যাগে প্রক্রিয়াজাত খাবার কিনে ব্যাগটি আশপাশে ফেলে দেন।

গ্রামের চিত্রটাও খুব বেশি সুখকর নয়। 'বাজার করার ব্যাগ' ঝামেলা মনে করে অনেক কর্মজীবী অফিস থেকে ফেরার পথে ছোট-বড় প্লাস্টিক ব্যাগেই বাজার করেন। গ্রামে ডাস্টবিন নেই। বাতাসে উড়ে পথে-ঘাটে-মাঠে গিয়ে পড়ে প্লাস্টিক ব্যাগ। মিশে যায় মাটির সঙ্গে, কিন্তু পচে না। বছরের পর বছর পরিবেশের ক্ষতি করে চলছে এই প্লাস্টিক ব্যাগ।

প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে এমন ধরনের রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয় যা মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে। গাছের ক্ষতি করে। একই সঙ্গে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষিত করে। দূষিত পানি পান করায় আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তেমনি জীববৈচিত্র্যের ওপর পড়ছে এর বিরূপ প্রভাব।

*চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলার কারণে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে লাখ লাখ জলচর প্রাণী। সাগরে ভেসে বেড়ানো প্লাস্টিক আবর্জনার সমস্যা বিষয়ে জার্মানির প্রকৃতি সুরক্ষা সমিতি 'নাবু'র (NABU) আবর্জনা বিশেষজ্ঞ বেনিয়ামিন বনগার্ড বলেছেন, 'সমস্যাটা এত বড় যে এর পরিমাপ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গবেষকরা এক দশকের বেশি সময় ধরে তীরে ভেসে আসা মৃত পাখির দেহ কেটে দেখছেন। মৃত পাখির পেটে গড়ে প্রায় ৩১টি প্লাস্টিকের টুকরো পাওয়া গেছে। সেই হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রতি বর্গকিলোমিটার সাগরের পানিতে প্রায় ১৮ হাজার প্লাস্টিক ভেসে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে অনেক টুকরো হয়তো মাইক্রোস্কোপে চোখ দিয়ে দেখতে হয়; আবার কোনো কোনো টুকরো প্লাস্টিকের ব্যাগের মতো বড়।

কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের পাকস্থলীতে বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক বর্জ্য পেয়েছেন। সামুদ্রিক কচ্ছপ সাধারণত জেলিফিশ, সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। জেলিফিশের আকার ও আকৃতি প্লাস্টিক ব্যাগের মতো হওয়ায় কচ্ছপ ভুল করে প্লাস্টিক ব্যাগ খেয়ে ফেলে। প্লাস্টিক বর্জ্য কচ্ছপের পেটে গেলে পরিপাকতন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। এতে কচ্ছপের মৃত্যু হয়। কচ্ছপের চেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় সাগরের তিমি। তিমির পাকস্থলীতেও প্লাস্টিক বর্জ্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও সাগরের মাছের পাকস্থলীতে প্লাস্টিকের উপস্থিতি রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, সামুদ্রিক কচ্ছপের একটি বড় অংশ এবং ৯০ শতাংশ পাখি সরাসরি প্লাস্টিক দূষণের শিকার। এছাড়া প্লাস্টিক ব্যাগের কারণে নদ-নদী নাব্যতা হারাচ্ছে। শহরে সৃষ্টি হচ্ছে মৌসুমী জলাবদ্ধতা। অপচনশীল এ যৌগ পদার্থটি মানবদেহে ক্যান্সারের সৃষ্টি করছে বলেও জানা যায়। বুড়িগঙ্গার পানির নিচে প্রায় ৮ ফুট পলিথিন বর্জ্যের যে স্তর জমেছে তা অনেকেরই অজানা।

আমাদের জীবনযাপনে জড়িয়ে গেছে প্লাস্টিকের বহুবিধ ব্যবহার। প্লাস্টিক পণ্য তুলনামূলক সস্তা, পানিরোধী, হালকা ও টেকসই হওয়ায় আমাদের মধ্যে এর দ্রুত বিস্তার ঘটছে। বর্তমান জীবনযাপনে প্লাস্টিকের জগ, মগ, থালা, এমনকি খাবার টেবিলটাও প্লাস্টিকের। প্লাস্টিকের বোতলে ওষুধ, তেল, চানাচুর, চকলেট, সস্, পানিসহ বিভিন্ন কোমল পানীয়। ঘরের চেয়ার, আলমারী, টেবিল, মোড়া, বদনা, সোপকেস, বালতি, গামলা প্লাস্টিকের। বাচ্চাদের রঙবাহারি খেলনাও তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে। মোবাইল, ল্যাপটপ, ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটারে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাস্টিক। বিদ্যুতের তার, চার্জারেও প্লাস্টিক। গান শোনার হেডফোনেও ঢুকেছে প্লাস্টিক। বাসের সিটে, রিকশা হুডে, অটো সাজাতে প্লাস্টিক। মাছ ধরার জালও প্লাস্টিকের। ছাতাতেও রয়েছে প্লাস্টিক। বাচ্চাদের স্কুলের ব্যাগ ও টিফিনবক্সও প্লাস্টিকের। হাসপাতালের বেডেও রয়েছে প্লাস্টিক। এমনকি আমাদের কলমটা পর্যন্ত প্লাস্টিক দখল করে নিয়েছে। স্যান্ডেল প্লাস্টিক, ফ্যানে প্লাস্টিক। আজকাল চায়ের কাপও হয়ে গেছে প্লাস্টিকের। বাচ্চাদের খাবার প্যাকেটের ভেতরও প্লাস্টিকের খেলনা। নিত্যদিনের জীবনযাপনে প্লাস্টিক যেন অপরিহার্য পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ আজ মানব সভ্যতার জন্য এক অশনি সংকেত। ২০০২ সালে আইন করে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও আইনের কোনো বাস্তবায়ন চোখে পড়ে না। আমরা চাই না প্লাস্টিক দূষণের শাসন। আর এর জন্য দরকার পুনঃব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিকের ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং তার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। আইন অমান্য করা প্লাস্টিক ব্যবহারকারীর কঠিন শাস্তি। প্লাস্টিকের বদলে পচনশীল পণ্য কম দামে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্লাস্টিক যাতে পরিবেশের সঙ্গে সহজে মিশে যায় এমন উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করতে হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার করে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তৃণমূলে সচেতনতা বাড়াতে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। তবেই সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশের নির্মল ছোঁয়ায় জাগবে প্রাণের স্পন্দন।

শব্দদূষণ: একটি ভয়ানক আতঙ্ক

মোঃ জাফর সিদ্দিক*

আপনি কি কানে কম শুনতে পান? অথবা অন্যেরা যখন কোনো ঘরের ড্রয়িংরুমে বসে স্বচ্ছন্দে টেলিভিশনের কোন সংবাদ বা অন্য কোন বিষয় উপভোগ করেন, তখন আপনি কি মনে করেন যে শব্দটি আরো জোরালে না হলে আপনি অনুষ্ঠানটি ভালভাবে শুনতে পাচ্ছেন না? ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে। অর্থাৎ যে শব্দ আপনি বা অন্য কেহ স্বচ্ছন্দে শুনতে পান, তা অন্য আরেকজন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না। এরকম হলে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন হতে পারে।

কারণ, আমরা সবাই ঘরে বাইরে ব্যাপক শব্দদূষণের শিকার হচ্ছি। এতে আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অথচ আমরা নিজে থেকে এটি সব সময় উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ, অভ্যাস আমাদেরকে উচ্চতর শব্দে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে, আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়ের সক্ষমতার একটা অংশ হয়তো ইতোমধ্যে হারিয়ে ফেলেছি; যা এখনো আমাদের উপলব্দির বাইরে।

শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি

- শব্দদূষণের ফলে শ্রবণক্ষমতা আংশিক কিংবা পুরোপুর বিনষ্ট হতে পারে। এ ক্ষমতা কম শব্দদূষণের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে পারে। আকস্মিক এবং মারাত্মক ধরনের শব্দদূষণের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে তাৎক্ষণিক।
- শব্দদূষণে অনিদ্রা হতে পারে যা থেকে অবসাদ, অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এতে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করার সামর্থ্য কমে যেতে পারে।
- উচ্চ শব্দে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার কারণে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়। যা পরিণামে হৃদরোগ কিংবা স্ট্রোকে রুপান্তরিত হতে পারে।
- শব্দদূষণের ফলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। যা এক সময় সিজোফ্রেনিয়ার মতো কঠিন মানসিক রোগে পরিণত হতে পারে।
- শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষণের গতি বিলম্বিত হতে পারে। তাদের আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

শব্দদূষণের ব্যাপকতা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ তে পরিচালিত একটি পর্যবেক্ষণ অনুসারে ঢাকা শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং জনাকীর্ণ স্থানে শব্দের মানমাত্রা ১২০-১৩০ ডেসিবল পর্যন্ত পাওয়া যায়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ অনুসারে ২০২২ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ৬১ শহরের মধ্যে ঢাকা শহরের অবস্থান ছিল একেবারে শীর্ষে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের কোনো জরিপ পরিচালিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে, এ যাবৎ ধরে নেওয়া হতো গ্রামাঞ্চলে শব্দদূষণের মাত্রা খুবই কম। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এ অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে সমগ্র শীতকাল জুড়ে ঢাউস আকৃতির লাউডস্পিকারের অবাধ ব্যবহার শব্দদূষণে অতীতের সকল মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে।

অপ্রতুল হলেও শহরে শব্দূষণের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কল্যাণে প্রচার প্রচারণা এবং আইনী তৎপরতা রয়েছে। এতে শব্দদূষণের বিভীষিকা না কমলেও এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে, গ্রামাঞ্চলে 'শব্দ দূষণ' কথাটা এখনও প্রায় অশ্রুত। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আইনের আওতায় জারিকৃত শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ সম্পর্কেও অনেকেও অবহিত নয়। এমতাবস্থায় প্রতিটি শীত মৌসুমে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিরীহ গ্রামবাসীগণ শব্দদূষণের ফলে যে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির কবলে লিপ্ত হন তা ভুক্তভোগীদের পক্ষেও জানা সম্ভব হয়না।

*সাবেক পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, আরণ্যক ফাউন্ডেশন

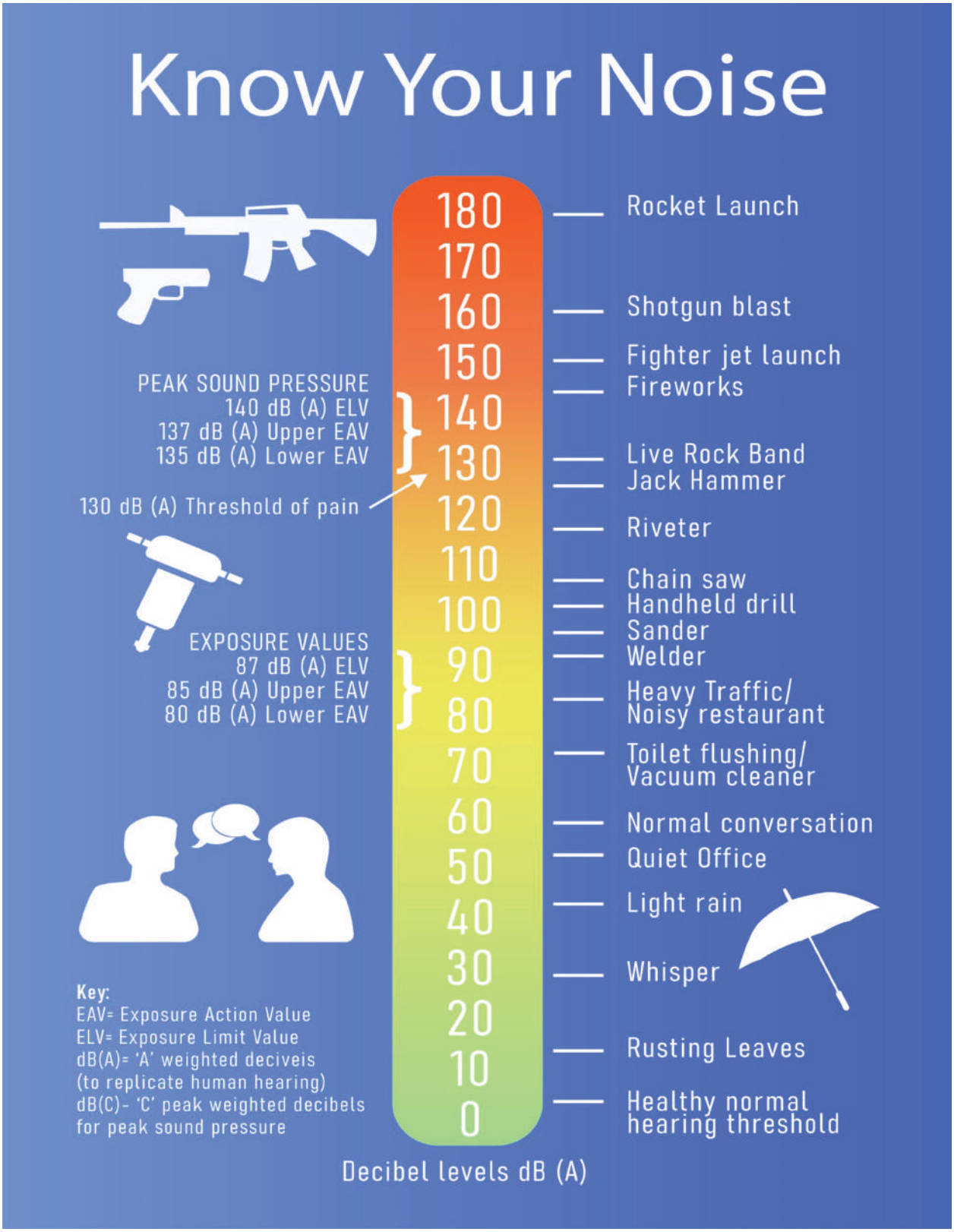

সূত্র: ইন্টারনেট (গুগল)।

প্রকট শব্দদূষণের তাৎক্ষণিক শিকার এমন একজন মানুষ আমার ফুফাতো ভাই যিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজি ফোটানোর খুব কাছে থাকায় চিরদিনের জন্য বধির হয়ে গিয়েছিলেন।

শব্দদূষণের মাত্রা

শব্দের মানমাত্রা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় প্রণীত শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় প্রদত্ত 'এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা' তালিকা নিচে প্রদান করা হ'ল:

এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণি	মানমাত্রা (ডেসিবল একক)	
		দিবা	রাত্রি
১	নীরব এলাকা	৫০	৪০
২	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
৩	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
৪	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
৫	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

পুরোপুরি নীরব একটি পরিবেশে দু'জন মানুষ ফিসফিস করে কথা বললে শব্দের মানমাত্রা হবে ৩০ ডেসিবল। স্বাভাবিক পরিবেশে এক মিটার দূরত্বে অবস্থানকারী দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ আলাপচারিতায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা প্রায় ৬০ ডেসিবল।

তালিকাটি দেখে শব্দের মানমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়ে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শব্দের মানমাত্রায় ১০ ডেসিবল বৃদ্ধি মানে হলো শব্দের তীব্রতার ১০ গুণ বৃদ্ধি। সে হিসেবে প্রদত্ত তালিকায় নীরব এলাকায় রাত্রিকালীন মান ৪০ থেকে দিবাকালীন শব্দের মান ৫০ হলেও শব্দের তীব্রতা হবে ১০ গুণ। একই হিসেবে মিশ্র এলাকার রাত্রিকালীন শব্দের মানমাত্রা ৫০ থেকে শিল্পএলাকার রাত্রিকালীন শব্দের তীব্রতা হবে ১০০ গুণ।

শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করার উপায়

শব্দদূষণ থেকে রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শব্দদূষণের ক্ষতির বিষয়ে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সচেতনতা। এ ধরনের সচেতনতা তৈরির জন্য সরকার, প্রশাসন এবং সকল সামাজিক সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস খুবই জরুরী। ব্যক্তিগত সচেতনতাও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি শব্দদূষণের ভয়াবহতা সম্পকে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হলে তিনি নিজকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

শব্দদূষণের ব্যাপারে ব্যক্তিগত সতর্কতা

শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

- মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণযুক্ত এলাকা কিংবা অনুষ্ঠানাদি এড়িয়ে চলা। এটি সম্ভব না হলে দূষণ সৃষ্টিকারী শব্দযন্ত্র হতে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান গ্রহণ করা। সম্ভবপর ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানস্থলে বেশিক্ষণ অবস্থান না করা।
- শব্দদূষণের কবলে পড়লে ব্যবহারের জন্য পকেটে সবসময় হালকা হেডফোন কিংবা একজোড়া ইয়ার প্লাগ রাখা। ইয়ার প্লাগ না থাকলে প্রয়োজনে দুই টুকরা তুলা (মেডিকেটেড) কানে গুঁজে দেওয়া। তুলার অবর্তমানে টিস্যু পেপারও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বাসার টিভি, মোবাইল ফোনের শব্দের তীব্রতা যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা।
- ঘরের বাহির হতে আসা শব্দের তীব্রতা কমানোর জন্য বাসার জানালায় ভারী পর্দা ব্যবহার করা।
- পরিবারের সদস্যদের ইয়ারফোন ব্যবহারের অভ্যাস থাকলে তার মাত্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনা তা যাচাই করা।

- ▲ গ্রাইন্ডার মেশিন ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে কানে ইয়ারফোন/হেডফোন লাগিয়ে বদ্ধ ঘরে এটি চালু করা, যাতে পরিবারের সদস্যগণ শব্দদূষণের শিকার না হন।
- ▲ অতিরিক্ত শব্দ উৎপন্নকারী ফ্যান বৈদ্যুতিক পাখা বা এ জাতীয় যন্ত্রপাতি বদলে ফেলা বা মেরামত করা, ইত্যাদি।

শব্দদূষণ রোধে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস

পরিবেশ রক্ষায় সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব অনেক বিস্তৃত। সে তুলনায় সংস্থাটির অবয়ব এবং সামর্থ্য এখনো সীমিত। উপজেলায় তো নয়ই, এমনকি সকল জেলাতেও পরিবেশের কোন কার্যালয় নেই। তবে, জেলা এবং উপজেলা এ দু'টি পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাদি দেখার জন্য দু'টি কমিটি রয়েছে। এ দু'টি কমিটি এবং স্থানীয় সামাজিক সংস্থামূহকে সক্রিয় করে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে জনসচেতনা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এ সব কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা যেতে পারে।

গ্রামীণ এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনি সমস্যা

গ্রামাঞ্চলে ভূমি মূলত আবাসিক এবং কৃষি। এখানে বাণিজ্যিক এবং শিল্প, এমনকি মিশ্র এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করার মতো এলাকা তেমন নেই। ফলে, কোন গ্রামীণ এলাকাকে শব্দদূষণ বিধিমালা অনুযায়ী পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করারও সুযোগ নেই। তাছাড়া এসব এলাকাকে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সাইবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন এবং সংরক্ষণের করা অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। আবার বাস্তবে এটি করা না হলে বিধি ভঙ্গের কারণে কারো বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়টি বিবেচনা করে ইউনিয়নভুক্ত গ্রামগুলোকে আবাসিক এলাকা হিসেবে ধরে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। শব্দদূষণ বিধিমালাটি সে ভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, গ্রামাঞ্চলে শব্দদূষণের মূল উৎস বা কারণ হলো বিশালাকৃতির লাউডস্পিকারের যথেচ্ছ ব্যবহার। অথচ এগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে শব্দদূষণ বিধিমালায় অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় কিংবা সামাজিক যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের শ্রবণযন্ত্রের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্যে লাউডস্পিকারের পরিবর্তে সহনীয় মাত্রায় শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে।

লক্ষণীয় যে, আকাশযান, রেলগাড়ি, এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির শব্দ এগুলোর স্থায়িত্বকাল খুব বেশি নয়। তাই এসব শব্দ এবং কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার একই মানদণ্ডে বিবেচনা যোগ্য নয়।

এসব বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলে শব্দদূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে মোটরযান আইনে যানবাহনে হাইড্রলিক হর্ণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যেতে পারে। এতে এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা বিভাজনের পরিবর্তে সভাস্থলে লাউডস্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাউডস্পিকারের আকৃতি/শব্দের মাত্রা, সভাস্থলে এগুলোর অবস্থান ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা তুলনায় সহজ হতে পারে। তাছাড়া বিধিমালার ৯ এবং ১০ বিধিতে যে 'শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি' ব্যবহারে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে সেখানে মানমাত্রার একটা সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বনসৃজন: ব্লু কার্বন-প্রাপ্তির নবদিগন্ত

মোঃ আরিফুজ্জামান আরিফ*
কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাসমী**

ম্যানগ্রোভ মানেই আমরা বুঝি সুন্দরবন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা আনন্দভ্রমণে যাওয়া। এর বাইরে কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি? অথচ এর বাইরেও অনেক কিছু আছে যেগুলো হয়তো আমরা কখনো ভাবতেই চাইনি। এই যেমন ধরুন সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বন হতে পারে ব্লু কার্বনের বিশাল এক আধার। ব্লুইকোনোমি সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই অবগত, ব্লু কার্বন সম্পর্কে ক'জন শুনেছি? অনেকে ভাবতেই পারেন ব্লু কার্বন আবার কি? কার্বন তো কালো জিনিস এইটা আবার নীল হয় কিভাবে! চলুন একটু জেনে আসি ব্লু কার্বন জিনিসটা কি? ব্লু কার্বন হলো মূলত সমুদ্র ও উপকূলবর্তী বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বিশেষত ম্যানগ্রোভ বন, সল্ট মার্স এবং সি-গ্রাস কর্তৃক শোষিত ও সঞ্চিত কার্বন। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্তভূমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও সমুদ্রসংলগ্ন তৃণভূমি অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে যে কার্বন জমা হয় তাকেই ব্লু কার্বন বলে। যেহেতু সমুদ্রের সাথে সম্পর্কিত ইকোনোমিকে ব্লু ইকোনোমি বলা হয় সেহেতু একইভাবে সমুদ্রের সাথে সম্পর্কিত কার্বনকে ব্লু কার্বন বলে।

ব্লু কার্বন প্রক্রিয়াটি বাস্তুতন্ত্রের বৃদ্ধির সাথে শুরু হয়, যা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে জৈব পদার্থ তৈরি করতে বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে। এই জৈব পদার্থটি তারপরে গাছের নিচে মাটি এবং পলিতে জমা হয়, যেখানে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকতে পারে। উপরন্তু, গাছপালা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে মারা যায়, তারা মাটিতে জৈব পদার্থ ছেড়ে দেয়, যা কার্বন সঞ্চয়ে আরও অবদান রাখে। অবক্ষয়িত উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ব্লু কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন বাড়ানো যেতে পারে, যা মাটি এবং পলিতে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ বাড়াতে পারে। পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্যে নতুন গাছপালা রোপণ করা বা বাস্তুতন্ত্রে জল এবং পুষ্টির প্রবাহ উন্নত করার জন্য হাইড্রোলজিক্যাল সংযোগ পুনরুদ্ধার করা জড়িত থাকতে পারে।

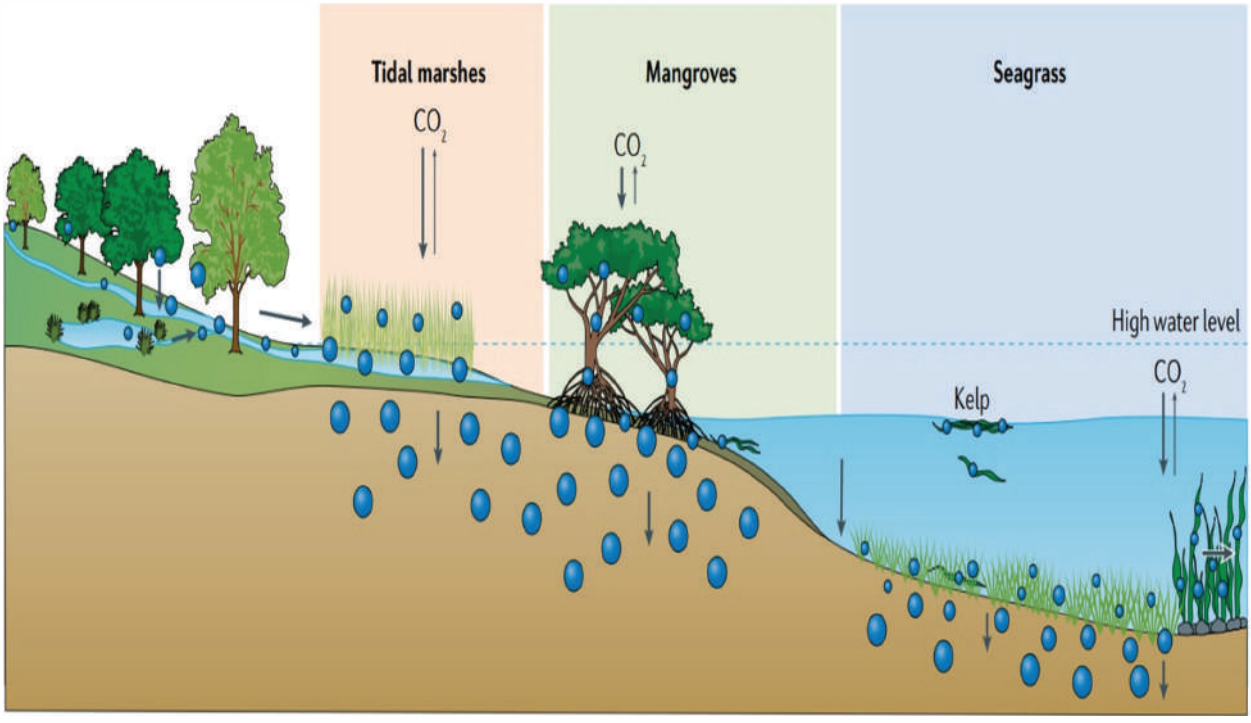

চিত্র:ব্লুকার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন

*টেকনিক্যাল এক্সপার্ট-ফরেস্ট্রি, ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি ফরেস্ট্রি, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন
**অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপদেষ্টা, ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি ফরেস্ট্রি, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন

আমরা একটু সচেতন হলেই কিন্তু বাংলাদেশ হতে পারে ব্লু কার্বনের বিশাল এক আধার। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের পাশাপাশি বাংলাদেশে আরও কিছু সম্ভাবনাময় জায়গা আছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার। আমরা চাইলেই কিন্তু এই উপকূলজুড়ে কিছু জায়গায় কয়েকটা সুন্দরবন তৈরি করতেই পারি। এরমধ্যে অপার সম্ভাবনার জায়গার নাম চকোরিয়া সুন্দরবন। পৃথিবীতে মনে হয় এই একটাই বন আছে যেখানে কোন গাছ নাই। চকোরিয়া সুন্দরবন এলাকার মোটামুটি ১০ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে এখন কেবলই শুধু লবণ চাষ এবং মাছের ঘের।

চিত্র: চকোরিয়া সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থা (লবণ চাষ ও চিংড়ি ঘের)

চকোরিয়ার এই জায়গায় যদি আমরা আবার ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করতে পারি তাহলে দেশের ফুসফুস কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে। পাশাপাশি কার্বন ক্রেডিট করে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। আমরা সবাই মোটামুটি জানি পৃথিবীতে একমাত্র গাছই আছে যার খাবার কার্বন-ডাই অক্সাইড। গাছ পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড সিকুয়েস্ট্রেশন করে এবং সেটা নিজের দেহে সঞ্চয় করে রাখে। সম্প্রতি একটা গবেষণায় দেখা গেছে, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের (Tropical Forest) চেয়ে ১০ গুণ বেশি কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং সমপরিমাণ এলাকায় ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের চেয়ে ৩-৫ গুণ বেশি কার্বন সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আমরা কেবলমাত্র এই সঞ্চিত কার্বনের ক্রেডিট ট্রান্সফার করেই কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। এখন কথা হলো আমাদের কাছ থেকে কেনো কার্বন ক্রেডিট কিনবে? কারণ বাংলাদেশ হলো ক্লাইমেট চেঞ্জের ইনোসেন্ট ভিক্টিম। পৃথিবীতে যে কার্বন নিঃসরণ হয় তার মাত্র ০.২১% বাংলাদেশ করে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির মুখোমুখি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে শুরুর দিকেই আছে। UNFCCC পৃথিবীর প্রতিটি দেশ কি পরিমাণ বায়ু দূষক বাতাসে নিঃসরণ করতে পারবে তার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ঠিক করে দেয়। যদি কোন দেশ সেই নির্দিষ্ট মাত্রার থেকে বেশি বায়ু দূষক নিঃসরণ করতে চায়, তাহলে অন্য যে দেশগুলি তাদের সেই নির্দিষ্ট মাত্রার কম বায়ু দূষক ত্যাগ করে, সেই দেশগুলি থেকে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত বায়ু দূষক নিঃসরণের পারমিট ক্রয় করতে হবে। এইভাবে বিশ্বব্যাপী বায়ু দূষণের পরিমাণ কমানো সম্ভব। ব্লু কার্বন কিন্তু শতশত বছর ধরে সমুদ্রের গভীরে জমা থাকার ফলে জীবাশ্ম জ্বালানিতে পরিণত হতে পারে যেটা ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে পারে।

ব্লু কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ হ্রাস করে, ব্লু কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের হারকে ধীর করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে সীমিত করতে সহায়তা করতে পারে। উপরন্তু, স্বাস্থ্যকর উপকূলীয় ইকোসিস্টেমগুলি বিস্তৃত প্রজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল প্রদান করে এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়কে ঝড় ও ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশকে প্রতিবছর কোন না কোন ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হতে হয় শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ার কারণে। বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্য যে বাংলাদেশের উপকূলে একটা সুন্দরবন আছে। এই সুন্দরবনই ঘূর্ণিঝড়কে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে রক্ষা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এই সুন্দরবন কিন্তু ব্লু কার্বনের সবথেকে বড় আধার। অথচ অযত্ন, অসচেতনতা, অবহেলায় আমরা দিনে দিনে সুন্দরবন ধ্বংস করছি। জাতিসংঘের তথ্য মতে, সারাবিশ্বে স্থলজ বনের তুলনায় ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে ৪ গুণ বেশি হারে। গবেষকদের মতে, ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সারাবিশ্বে ৩৫ শতাংশ ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে সারাবিশ্বের ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেহেতু ম্যানগ্রোভ বন ব্লু কার্বনের বিশাল এক আধার সেহেতু ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে নির্গত হবে। এর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের গতিকে কয়েকগুণ ত্বরান্বিত করবে।

কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনের কৌশলের ক্ষেত্রে ব্লু কার্বনের উপর মনোনিবেশের অভাব এ কথাই বলে যে বাংলাদেশকে কৌশলগত কার্বন পৃথকীকরণ ভান্ডার হিসেবে তার উপকূলীয় ইকোসিস্টেমের ধারণার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এমনটা হতে পারে যে, বাংলাদেশের বন সৃজন ও বনায়ন উদ্যোগের পূর্ববর্তী কয়েকটি কার্যকলাপের আওতায় উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবন দানের ক্ষুদ্র প্রেক্ষিতগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক জলবায়ু নীতির বিবর্তিত প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই ধরনের প্রকল্পগুলির চিহ্নিতকরণ এবং ব্লু কার্বন-এর বৃহত্তর ছত্রচ্ছায়ায় সেগুলির একত্রীকরণ অপরিহার্য। বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত যে দেশটি এত দিন যাবৎ প্রধানত খুব কম সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত ব্লু কার্বন সংক্রান্ত সমজাতীয় গবেষণা করেছেন। সরকারের উচিৎ ব্লু কার্বন সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যভান্ডারগুলির নির্মাণ, সঙ্কলন এবং আনুষ্ঠানিকীকরণের উপর জোর দেওয়া। ব্লু কার্বন পরিসরে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে আর্থিক ও নীতিগত পদক্ষেপের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য কৌশলগত মিশন চালু করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কৌশলগত মিশনটি ব্লুকার্বন বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়নের নিরিখে অবদানকারী প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির জন্য জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে পারে। এটি ব্লু কার্বন বাধ্যবাধকতার মতো সম্ভাব্য চাহিদা তৈরির পদক্ষেপগুলিকে শনাক্ত করতে পারে এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিসরে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিকে সক্রিয় করে তোলার উপরেও জোর দিতে পারে। দেশে একটি শক্তিশালী কার্বন বাজার গড়ে তোলা এই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে। সময় এসেছে বেসরকারি ক্ষেত্র, এনজিও বা পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে পাইলট প্রকল্পের সূচনা করা। ব্লু কার্বন, কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, ফরেস্ট্রি, সমুদ্র বিজ্ঞান বা এনভাইরেনমেন্ট সায়েন্সের কাজ করেন তাদের সাথে বসে কিভাবে ব্লু কার্বনকে স্টোর করে বাণিজ্য করা যায় সে বিষয়েও অগ্রগামী হওয়াটাও জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো ম্যানগ্রোভ নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সময়োপযোগী চাহিদা হয়ে পড়েছে। নীতিমালা প্রকাশের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেন দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র: ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ বাড়তে পারে

অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার*

জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীব্যাপি বাড়ছে তাপমাত্রা। গত এপ্রিলের ১৭ তারিখ সোমবার পাবনাতে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ১৬ এপ্রিল যশোর ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বোচ্চ ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস; যা ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ। বিপদসীমা অতিক্রম করছে সমুদ্র ও নদীর পানির উচ্চতা। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী তিন দশকে ২১ কোটি ৬০ লাখ মানুষকে ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণ এবং সম্পদের ব্যবধান কমিয়ে আনার জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাহকবাহিত নতুন নতুন রোগ আসবে এবং পুরনো রোগ নিয়ন্ত্রণেও নতুন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া, নাগরিকদের অপেক্ষাকৃত নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, সচেতনতার অভাব এবং জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণে হওয়ায় বাংলাদেশের মতো মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সংক্রামক রোগের প্রকোপ বেড়ে চলেছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগ-শোকের ঝুঁকি বাংলাদেশে বেশি।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১২৬ প্রজাতির মশা শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বর্তমান ঢাকাতে আমরা বর্তমানে পাই ১৬ প্রজাতির। উষ্ণ আদ্র আবহাওয়া থাকার কারণে বাংলাদেশ মশা ও মশাবাহিত রোগ বিস্তারের জন্য উত্তম জায়গা। বাংলাদেশ মশাবাহিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও জাপানিজ এনসেফালাইটিস।

Diseases	Vectors	Picture
Malaria	*Anopheles*	
Dengue	*Aedes*	
Chikungunya		
Zika		
Filariasis	*Culex*	
Japanese Encephalitis		

*কীটতত্ত্ববিদ, গবেষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালে প্রথম যখন ডেঙ্গু আসে তখন এটিকে ঢাকা ফিভার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ডেঙ্গুর ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি হয় ২০০০ সালে। ওই বছর সরকারি হিসাবমতে ৫,৫০০ জন মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং ৯৩ জন মারা যায়। বাংলাদেশে ডেঙ্গু সবচাইতে বড় আঘাত হানে ২০১৯ সালে। এ বছর প্রায় ১০১,৩০০ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং সারা বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসেব মতে ২০২২ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৬২,৩২১ ও ২৮১ জন।

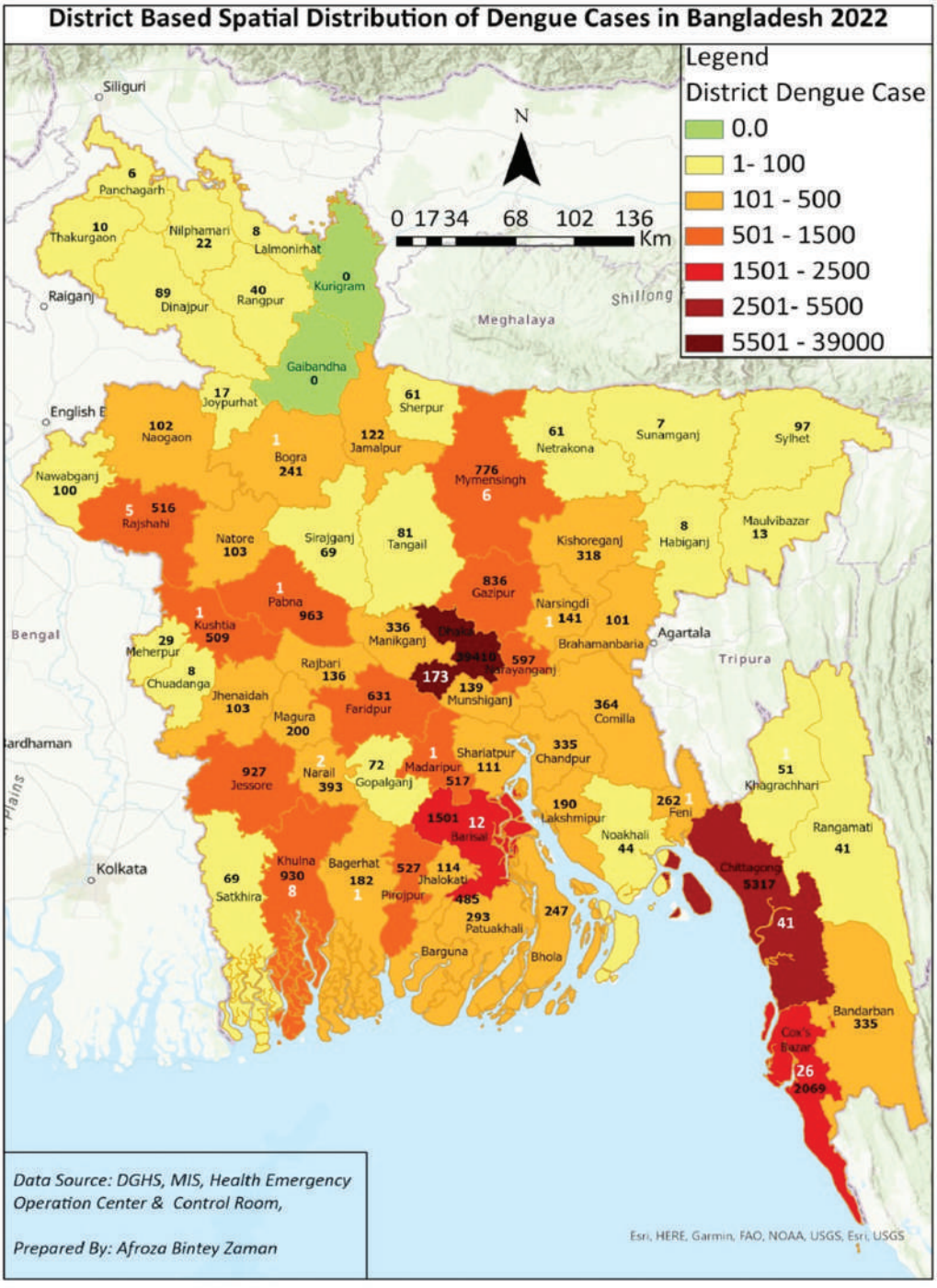

বাংলাদেশ ডেঙ্গু ম্যাপ ২০২২

ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটায় ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী এডিস মশার দুটি প্রজাতি। যার একটি হলো এডিস ইজিপ্টি আরেকটি হলো অ্যালবোপিকটাস। এডিস ইজিপ্টিকে শহরে মশা বা নগরের অথবা গৃহপালিত মশা বলা হয় আর অ্যালবোপিকটাসকে বলা হয় এশিয়ান টাইগার মশা অথবা গ্রামের মশা। এডিস মশা পাত্রে জমা পানিতে জন্মায় ও বর্ষাকালে এর বংশবিস্তার বেশি হয়। তাই ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব এই সময়টায় বেড়ে যায়।

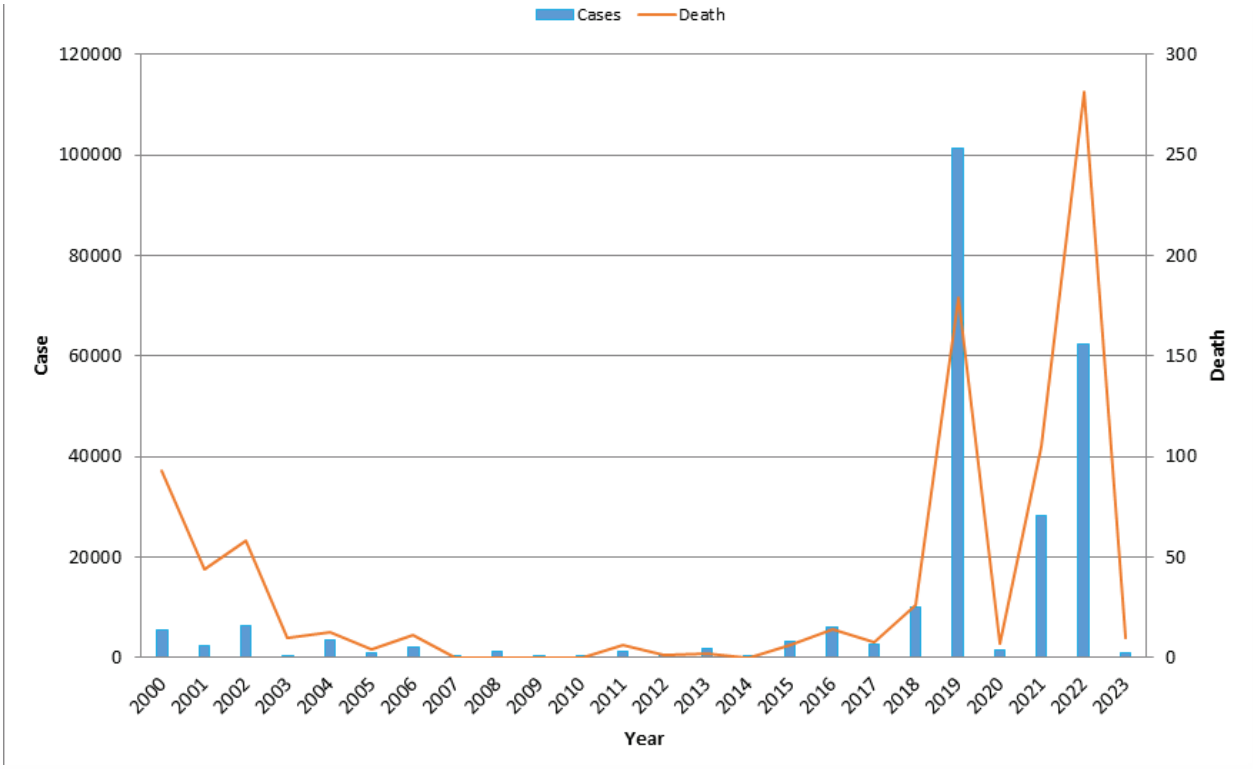

দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগে ভর্তি রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা (২০০০-২০২৩)

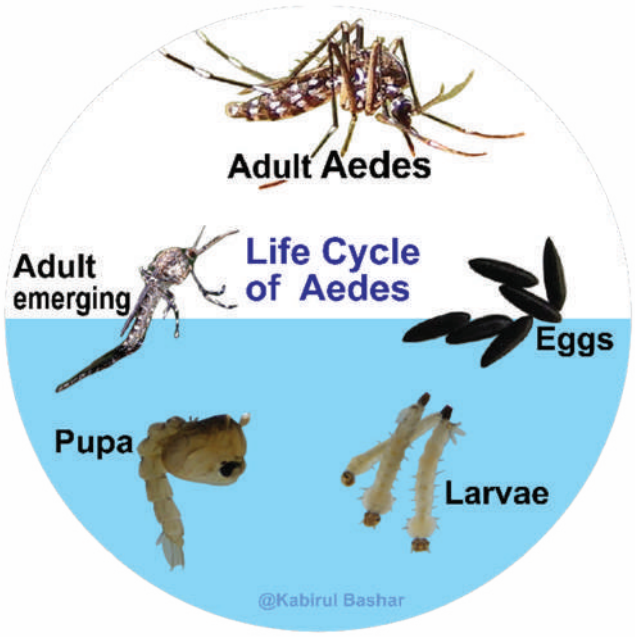

এডিস মশার জীবনচক্র

২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম চিকুনগুনিয়া ধরা পড়ে যেটি ডেঙ্গুর মত একটি রোগ। এই রোগটি চিকুনগুনিয়া ভাইরাস বহনকারী এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া রোগ শনাক্ত হয়। ঢাকাতে সবচাইতে বেশি চিকুনগুনিয়া শনাক্ত হয় ২০১৬-২০১৭ সালে।

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীব্যাপী মশাবাহিত রোগের মধ্যে অন্যতম হলো ম্যালেরিয়া। অ্যানোফিলিস মশার সাতটি প্রজাতি বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। এর মধ্যে চারটি প্রজাতিকে প্রধান বাহক বলা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা এবং বর্ডার এরিয়ায় মোট ১৩ জেলায় ৭২টি উপজেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ২০০০ সালের পর সবচাইতে বেশি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ২০০৮ সালে। ২০০৮ সালে ৮৪,৬৯০ জন মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ১৫৪ জন মারা যায়। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে এই সংখ্যাটি কমে রোগী হয় ১৭,২২৫ জনে। ম্যালেরিয়া বাহক অ্যানোফিলিস মশা গ্রীষ্ম-বর্ষায় জন্মায় এবং এই সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

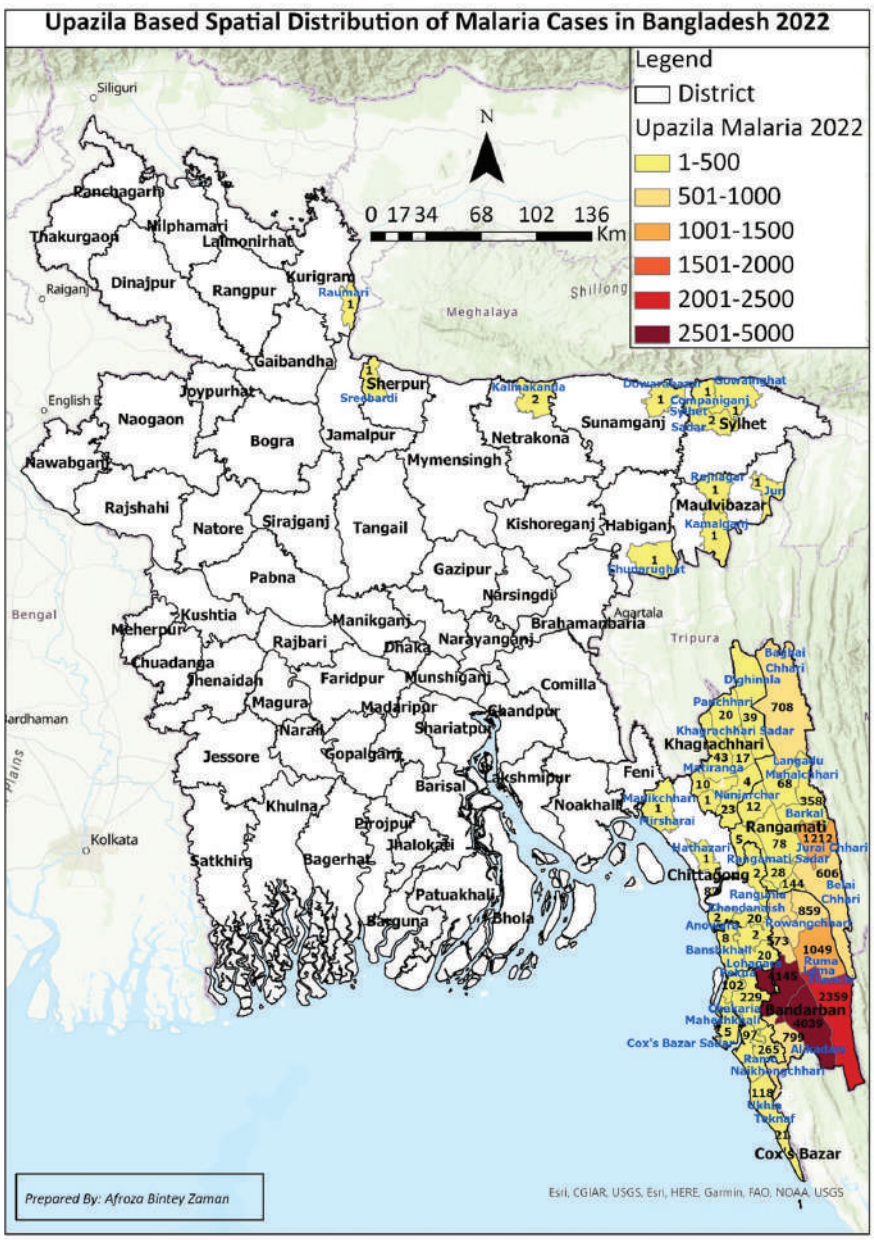

বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ম্যাপ ২০২২

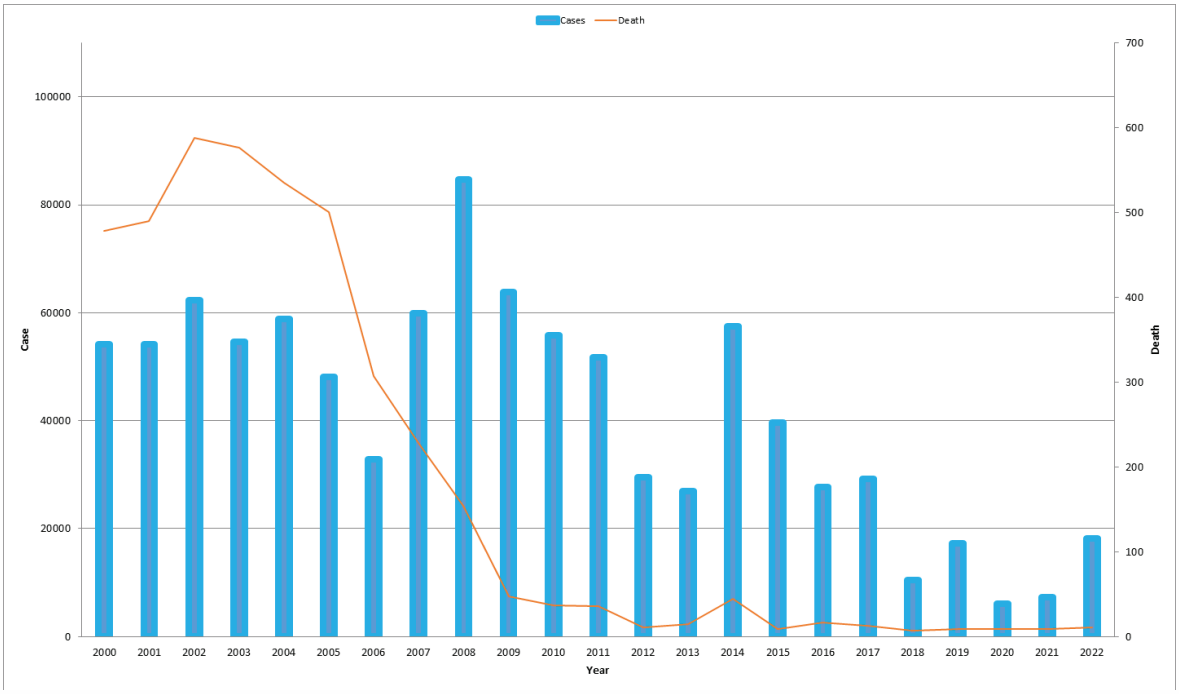

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যু সংখ্যা (২০০০-২০২২)

মশাবাহিত আরেকটি ভয়াবহ রোগের নাম ফাইলেরিয়া। এ রোগে মানুষের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে। স্থানীয়ভাবে এই রোগটিকে গোদ রোগ বলা হয়ে থাকে। ফাইলেরিয়া রোগটির বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণের প্রায় ৩৪টি জেলাতে কম বেশি প্রাদুর্ভাব আছে। একসময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল তবে বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ফাইলেরিয়া এলিমিনেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। ফাইলেরিয়া নেমাটোড জাতীয় কৃমি; ইউচেরিয়া ব্যানক্রফটি বাহিত মশার দ্বারা সংক্রমিত হয়। কিউলেক্স মশার দুটি প্রজাতি ও ম্যানসোনিয়া মশার একটি প্রজাতির মাধ্যমে বাংলাদেশে এ রোগ ছড়ায়।

ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগীর পা এবং ফাইলেরিয়া জীবাণু

প্রজাতি ভেদে মশার রোগ বিস্তারের ক্ষমতা, প্রজনন স্থল, প্রজনন ঋতু ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভিন্ন। তাই মশা নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য এর জীবনাচরণ সম্পর্কে জানা দরকার। মশার বায়োলজি, ইকোলজি, স্বভাব পর্যালোচনা কওে এর নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনার (Integrated Mosquito Management) বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ প্রয়োজন। একটি সময়োপযোগী আধুনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সঠিক বাস্তবায়ন মশাবাহিত রোগনিয়ন্ত্রণের অন্যতম চাবিকাঠি।

সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনার নিম্নলিখিত চারটি অংশ রয়েছে:

১. পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার কারণে মশার জন্ম হয়। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মশার প্রজনন স্থল কমানো এবং ধ্বংস করে মশাকে সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ জলাধার পরিষ্কার এবং বিভিন্ন পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।

২. জীবজ নিয়ন্ত্রণ: উপকারী প্রাণীর মাধ্যমে মশাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ গাপ্পি মাছের কথা আমরা জানি যার মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে অল্প খরচে টেকসই মশা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কপিপোড এবং এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহারও পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। এজাতীয় জীবজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৩. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ: মশা নিয়ন্ত্রণে লার্ভিসাইড এবং এডাল্টিসাইড কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি কীটনাশকের একটি নির্দিষ্ট ডোজ এবং কত দিন পর পর কোন মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে তারও একটি নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করলে অবশ্যই মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৪. মশা নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণ: জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া মশা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়া দুষ্কর। তাই এ প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে সামাজিক সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে একাজ করানো যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো প্রয়োজন হলে মশাবাহিত রোগনিয়ন্ত্রণে আইনের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নতুন নতুন রোগ আসবে এবং এগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মশা ও মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি অত্যন্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাহকবাহিত রোগ গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে Vector Control Research Centre (VCRC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। ভারত সরকার এ প্রতিষ্ঠানটিকে অত্যন্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তৈরি করেছে।

বাংলাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হলে, বাহকবাহিত রোগ, ও বাহক মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কীটনাশক, যন্ত্রপাতি এবং এর রোগতত্ত্ব নিয়ে সারাবছর গবেষণা করবে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) মশা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। বাংলাদেশ যেকোনো স্থানে বাহকবাহিত কোন নতুন রোগ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ন্ত্রণে তারা পদক্ষেপ নেবে।

শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেই হবেনা। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিতে হবে অত্যন্ত অভিজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদদের হাতে। প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব অভিজ্ঞ মানুষের হাতে না দিলে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমি অবক্ষয় রোধের প্রয়োজনীয়তা: UNCCD প্রেক্ষিত

ড. মুঃ সোহরাব আলি*
ফারহানা মুস্তারী**

বিশ্বময় মরুকরণ ও খরার প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৫ সাল হতে প্রতি বছর ১৭ জুন বিশ্ব মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ভূমির অবক্ষয় রোধ বা এ কার্যক্রমে গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবক্ষয়িত এলাকা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিই এর মূল লক্ষ্য।

আন্তজার্তিক প্রেক্ষাপট:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের বর্ধিত চাহিদার কারণে বিশ্বব্যাপী ভূমির ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় ক্রমবর্ধমান মানুষ,ও তাঁর উচ্চভীলাষী চাহিদা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার ভবিষ্যত প্রজন্মকে কঠিন ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে ফ্যাশন/পোষাক শিল্পের চাহিদা মেটাতে বর্তমানের তুলনায় আরও ৩৫% বেশি জমি প্রয়োজন হবে যা ১১০০ মিলিয়ন হেক্টরেরও অধিক [১]। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, এক কেজি তূলা উৎপাদনের জন্য প্রায় ২০,০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয় এবং একটি 'টি-শার্ট'-এর সুতার জন্য তুলা উৎপাদন করতে ২,৭০০ লিঃ পানির প্রয়োজন হয়। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ১.৮ বিলিয়ন জনগোষ্ঠী তীব্র পানি সংকটে পড়বে। এছাড়াও বিশ্বের প্রায় ৬০০ মিলিয়ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা প্রাণীসম্পদের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বে কৃষিজমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহৃত হয় গোচারণ ভূমি অথবা গো-খাদ্য উৎপাদনে। এতে করে প্রতি বছর ১৩ বিলিয়ন হেক্টর বনভূমি কৃষি অথবা গো-চারণভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

শুধু তাই নয় COVID-19 এর এ সংকটময় সময় আমাদের বুঝিয়েছে যে, আমাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য ব্যবস্থা এবং জীবিকার জন্য আমরা অন্যান্য প্রজাতি ও প্রকৃতির উপর কতটা নির্ভরশীল। মূলত মানুষ ও অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুর অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির উপর মানুষের যে আগ্রাসী আচরণ তা পৃথিবীতে মহামারীর সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। United Nations to Combat Desertification (UNCCD)-এর তথ্যমতে প্রতি চারটি ভয়াবহ মহামারির তিনটি এ আগ্রাসী আচরনের কারণে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন বাণিজ্যিক পশুপালন; সোয়াইন এবং এভিয়ান ফ্লুর মতো রোগের সংক্রমণের পাশাপাশি মানুষকে জীবানু প্রতিরোধে অক্ষম (antimicrobial resistance) করে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রেখে চলেছে।

ভূমি এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা মানবসৃষ্ট কার্বন নি:সরণের প্রায় অর্ধেক শোষণ করে তাই এদের প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। একইসাথে উর্বর ভূমি এবং জীববৈচিত্র্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরিত্রীকে সুরক্ষায় তিনটি Rio Conventions (UNCCD, UNCBD, and UNCCD)-এর কাজের সমন্বিত মাধ্যম হচ্ছে প্রকৃতির উপায়ে সমাধান (Nature Based Solutions). যেমন এরকমই একটি উদাহরন, উপকূলীয় এলাকায় কোরাল রীফ, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সংরক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব উপকূলীয় এলাকায় ভাঙ্গণ রোধ এবং বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলা। উপকূলীয় বন সংরক্ষণ শুধু জীববৈচিত্র্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় এটি স্থিতিশীল জলবায়ু, খাবার ও ভূগর্ভস্থ স্বাদু পানির স্তরে স্থিতিশীল রাখার জন্যও অনস্বীকার্য।

ভূমি অবক্ষয় রোধ শুধু জীববৈচিত্র্য রক্ষা জন্যই প্রয়োজন তা নয়, ভূমি অবক্ষয় শতকরা ৬০ ভাগ মিথেন নি:সরণের জন্য দায়ী। বিভিন্ন ধরনের Unsustainable কৃষি ব্যবস্থার জন্যও এ মিথেন নি:সরিত হয়। টেকসই কৃষি এবং ভূমি ব্যবহারও তিনটি Rio Conventions-এর কাজের অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যা Koronivia joint work on agriculture নামে স্বীকৃত [২]। যদি ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা (Land Degradation Neutrality-LDN) অর্জন করা না যায় তবে ২০৪৫ সালের মধ্যে ১৩৫ মিলিয়ন মানুষ খরার কারণে উদ্বাস্তু হবে। অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর অভিঘাত আমাদের জন্য চরম বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব চরম সংকটের সম্মুখীন। অবক্ষয়িত ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার করা গেলে প্রায় ৩ বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ কমানো যাবে। সুতরাং ভূমিসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন করা সম্ভব [৩]।

1 www.unccd.int/
2 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-rio-conventions
3 https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/land

*পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
**উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১১১৯ (বিবিএস, আদমশুমারী ২০২২) জন বসবাস করে যা পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ। আগামী ২০ বছরে ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। বাংলাদেশে প্রকৃত (Net) ফসলি জমি ১.৯৬ কোটি একর যা উপরোক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তিত হবার পাশাপাশি কৃষি জমির পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। যেমন নতুন ঘরবাড়ী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান/ শিল্পাঞ্চল স্থাপন, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরিতে আবাদযোগ্য জমি বছরে প্রায় ৬৯,০০০ হেক্টর কমে যাচ্ছে। যদিও কৃষি গবেষণা ও শস্য উৎপাদনে বিজ্ঞানীরা পূর্বের তুলনায় বেশ কিছু সফলতা দেখিয়েছেন তথাপি দেশের ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন এখনই কৃষি সংরক্ষণের সকল উপায় অবলম্বন।

বাংলাদেশে ১৪,২৯,০৮৫ হেঃ বা ৯.৭% খরা ক্লিষ্ট ভূমি রয়েছে যার মধ্যে ২,৮০,১৭৫ হেঃ অতি তীব্র খরা, ৪,২২,১৪০ হেঃ তীব্র খরা এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।দেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে প্রাকৃতিক জলাধার, খাল-বিল ভরাট/দখল, নির্বিচারে বন উজাড়, মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে ভূমির অবক্ষয় ও খরার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে একদিকে নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য অপরদিকে বাড়ছে গ্রীণ হাইজ গ্যাস নি:সরণ।

ভূমির অবক্ষয় রোধে আমাদের করণীয়ঃ

১. "Bangladesh National Action Program (NAP) to Combat Desertification, Land Degradation and Drought 2015-2024" বাস্তবায়ন করা;

২. জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ বাস্তবায়ন করা;

৩. অধিক হারে বৃক্ষরোপন ও বনায়ন করা, অবক্ষয়িত বনভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা;

৪. জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং যথাসম্ভব জমিতে জৈব কৃষি উপকরণ ব্যবহার করা;

৫. টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বিশেষ করে ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা (Land Degradation Neutrality-LDN: 15.3) লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৬. জলাধার সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমানো;

৭. ভূমির অবক্ষয় ও খরার ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর থেকে উত্তোরণের উপায় সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য মানুষের মধ্যে প্রচার করা যাতে জনগণ সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের করনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পায়;

৮. "ভূমি শুধু রাজস্ব আদায়ের জন্য"- এমন ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে "ভূমির প্রাণ আছে এর যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন" এরূপ ধারনার প্রবর্তন করা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা;

৯. মাটির স্বাস্থ্য যাতে শস্য উৎপাদান উপযোগী থাকে ও এলাকাটিতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। খরা প্রবণ অঞ্চলে জনপদ ধরে রাখার জন্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম জোরদার করা ও পরিবেশ উন্নত রাখা।

আমরা জানি আমাদের এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ভূমির উপর নির্ভরশীল এবং ভূমি অবক্ষয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা, পরিধেয় উপকরণ এবং প্রাণীসম্পদের খাদ্যের জন্য ভূমির উপর চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আমাদের সীমিত ভূমি সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপের কারণে প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি ইতোমধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০৩০ সালের মধ্যে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনের জন্য ভূমি অবক্ষয় রোধ বা অবক্ষয়িত ভূমি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও পরিবেশবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ভূমির অবক্ষয় রোধ, ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি পরিবর্তন হ্রাস এবং পশুপাখির প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পশুপাখির মাধ্যমে ছড়ানো মহামারির (zoonotic pandemics) ঝুঁকি কমানোই হবে আমাদের প্রকৃতির সাথে অঙ্গীকার। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পানীয় জলের নিরাপত্তা এবং টেকসই জীবিকা অর্জনসহ ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা লক্ষ্যমাত্রা (Land Degradation Neutrality targets-SDG 15.3), প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বায়ুদূষণের কারণ, স্বাস্থ্যগত প্রভাব ও পদক্ষেপ

নাজিম হোসেন শেখ*

বায়ুদূষণ কী?

বায়ুদূষণ অর্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ যাহা নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক পরিমাণে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত থেকে বায়ুর (গৃহাভ্যন্তর ও বাহিরের) স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করে, জনস্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধিত হয় বায়ুর এইরূপ অবস্থা। এটি মূলত রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, শারীরিক বা জৈব মাধ্যম দ্বারা গঠিত ভেতরের বা বাইরের পরিবেশের এক প্রকার দূষণ যা বায়ুমন্ডলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিবর্তন করে দেয়। বিভিন্ন ধরণের বায়ুদূষক রয়েছে, যেমন (অ্যামোনিয়া, কার্বন-মনোক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লোরোকার্বন), বিভিন্ন কণা (জৈব এবং অজৈব উভয়)। বায়ুদূষণের কারণে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, অ্যালার্জি এমনকি মানুষের মৃত্যুও হতে পারে; এটি প্রাণী এবং খাদ্যফসলের মতই অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর, প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, ওজোন স্তর ক্ষয় বা অ্যাসিড বৃষ্টি প্রভৃতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বায়ুদূষণের প্রধান কারণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ। তবে প্রাকৃতিক ঘটনার কারণেও বায়ুদূষণ হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসেবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ুদূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে। সারাদেশে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা পরিচালনা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিল্প কারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ ও যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া, কঠিনবর্জ্য ও বায়োমাস পোড়ানো, ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়াও আন্তঃসীমান্ত (transboundary) দূষণ দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বায়ুদূষণ অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন ও ১৫ টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনের মাধ্যমে বায়ুমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা PM2.5 এবং PM10, SO2, CO, NOx এবং O3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত PM2.5 প্যারামিটারটি সবসময় AQI হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। PM2.5 প্যারামিটারটির বায়ুতে ঘনত্ব বা মান 0 থেকে 20.4 mg/m3 এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা ভালো, 20.5 থেকে 40.4 mg/m3 এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা মোটামুটি 40.5 থেকে 65.4 mg/m3 এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা সতর্কতামূলক, 65.5 থেকে 110.4 mg/m3 এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা অস্বাস্থ্যকর, 110.5 থেকে 350.4 mg/m3 এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা খুব অস্বাস্থ্যকর, 350.5 mg/m3 এর উপরে হলে AQI অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সকল মনিটরিং স্টেশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক বা Air Quality Index (AQI) পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

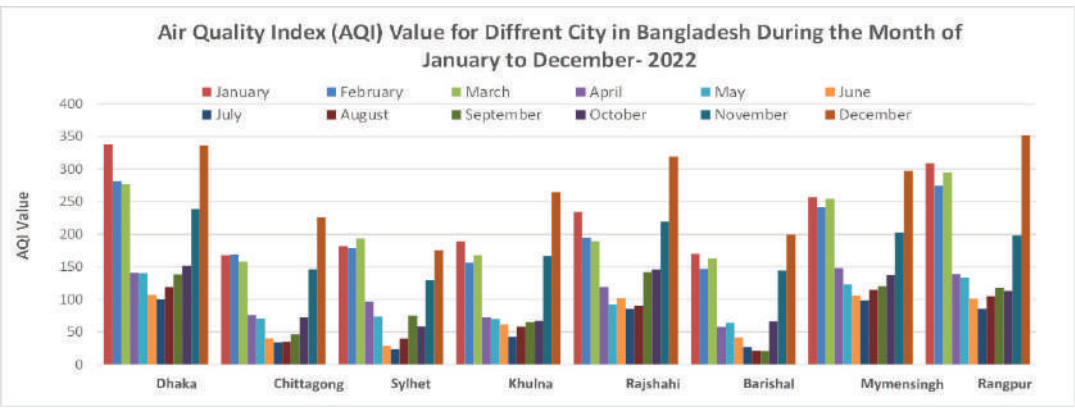

চিত্র-২: আটটি বিভাগীয় শহরে জানুয়ারি-ডিসেম্বর (২০২২) মাসের AQI এর তুলনামূলক চিত্র

*উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Striving for clean Air (Air pollution on Public Health in South Asia) গবেষণা প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের মূল উৎস রেসিডেনসিয়াল এন্ড কর্মাসিয়াল- (রান্নার কাজে বায়োমাস পোড়ানো), বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বড় শিল্প কারখানা, ইটভাটাসহ ছোট শিল্পকারখানা, ট্রান্সপোর্ট, পৌরবর্জ্য, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ, নির্মাণ ডাস্ট ও অন্যান্য। উক্ত প্রতিবেদনে ঢাকার বায়ুদূষণের এলাকাভিত্তিক উৎস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঢাকা নিজস্বভাবে ১০%, ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা ২৫%, ঢাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য বিভাগ ৩৫% এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ৩০% বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে। এছাড়া প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকাসহ দেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সাশ্রয়ী (cost effective) ও কার্যকর পদক্ষেপ হলো রান্নায় ব্যবহৃত সলিড ফুয়েল (বায়োমাস) ব্যবহারের পরিবর্তে Clean Fuel (LPG/Gas) ব্যবহার করা এবং কৃষির অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ ও পরিবেশবান্ধব পৌরবর্জ্য (Municipality Waste management) ব্যবস্থাপনা করা। যার মাধ্যমে দেশের বায়ুদূষণের সিংহভাগ কমানো সম্ভব হবে।

বায়ুদূষণের স্বাস্থ্যগত প্রভাব

বায়ুদূষণ শ্বাসনালির সংক্রমণ, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসীয় ব্যাধি, স্ট্রোক এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সহ দূষণজনিত বেশ কয়েকটি রোগের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির কারণ । বায়ুদূষণের কারণে আইকিউ স্কোর বা বুদ্ধ্যাঙ্ক হ্রাস, মেধার দুর্বলতা, মানসিক ব্যাধি যেমন বিষণ্নতা এবং প্রসবকালীন ক্ষতিকারক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি হতে পারে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নিম্নমানের বায়ুর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, এটি প্রধানত শরীরের শ্বসনতন্ত্র এবং সংবহন তন্ত্রকে প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কোন ধরনের দূষকের সংস্পর্শে আসছে, প্রভাবকের মাত্রা কী পর্যায়ের, ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং বংশগতির উপর বায়ুদূষক পদার্থ বা উৎসগুলোর প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। সাধারণত: ৬৫ বছরের ঊর্দ্ধে বয়স্ক মানুষ এবং ৫ বছরের নিম্নে বয়সী শিশু বায়ুদূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়। তাছাড়া যাদের শ্বাসযন্ত্র বা অন্যান্য রোগ রয়েছে. তাদের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত বেশি হয়।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হিসেবে বায়ুদূষণকে দায়ী করা হয়; প্রতি ৫টি'র মধ্যে ৪টি মৃত্যুর ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। স্ট্রোক, হার্ট ডিজিজ, ক্রমিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের প্রভাব রয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ৭৮,১৪৫-৮৮,২২৯ মৃত্যু এবং ১.০বিলিয়ন-১.১বিলিয়ন দিন অসুস্থতা নিয়ে কেটেছে এবং ৩.৯-৪.৪% জিডিপি ক্ষতির শিকার হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী অকালমৃত্যুর জন্য বায়ুদূষণকে চতুর্থ প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৯ সালে সারাবিশ্বে প্রায় ৬.৬৭ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য বায়ুদূষণকে দায়ী করা হয় (সূত্র: বিশ্বব্যাংক)। এসব মৃত্যুর অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে পিএম২.৫ কে মনে করা হয়। ২০০৮ সালের ব্ল্যাকস্মিথ ইনস্টিটিউট বিশ্বের দূষিত স্থানের প্রতিবেদনে ঘরের ভেতরে বায়ুদূষণ এবং নিম্নমানের শহুরে বায়ুর গুণমানকে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ বিষাক্ত দূষণ সমস্যা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ৬টি প্রধান বায়ুদূষক চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা- পিএম২.৫, পিএম১০, ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন ওজোন (O3), সালফার ডাই অক্সাইড (SO2), নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2), কার্বন মনোক্সাইড (CO)। এদের মধ্যে পিএম২.৫ কে মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক মনে করা হয়, কেননা এর আণুবীক্ষনিক আকারের কারণে এটা সহজেই নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে ফুঁসফুস হতে রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরের সকল প্রধান অঙ্গসমূহে পৌছায়। পিএম২.৫ এর কারণে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এবং শ্বসনযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটার কারণে এ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, ও ফুসফুসের ক্যান্সার আক্রান্তদের অবস্থার আরো অবনতি হয়। মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর বায়ুদূষণসৃষ্ট রোগবালাই নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো-

Organ System	Disease
Brain	Stroke, dementia, Parkinson's disease
Eye	Conjunctivitis, dry eye disease, blepharitis, cataracts
Heart	Ischemic heart disease, hypertension, congestive heart failure, arrhythmias
Lung	Chronic obstructive pulmonary disease, asthma, lung cancer, chronic laryngitis, acute and chronic bronchitis

Organ System	Disease
Liver	Hepatic steatosis, hepatocellular carcinoma
Pancreas	Type 1 and 2 diabetes
Gastrointestinal	Gastric cancer, colorectal cancer, inflammatory bowel disease, Crohn's disease, appendicitis
Urogenital	Bladder cancer, kidney cancer, prostate hyperplasia
Joints	Rheumatic diseases
Bone	Osteoporosis, fractures
Nose	Allergic rhinitis
Skin	Atopic skin disease, skin aging, urticaria, dermographism, seborrhea, acne

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ

সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" (সংশোধিত ২০১৯) জারী ও বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার অধিকাংশ অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ইটভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির ৮২.৫৬% ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি কম্প্যাক্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (Compact-CAMS) চালু করা হয়েছে। এ সকল CAMS-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বায়ুর মান পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)" এর ক্ষমতাবলে পোড়ানো ইটের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সড়ক ও মহাসড়ক ব্যতীত সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে (ভবন, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা, গ্রামীণ সড়ক টাইপ-বি) ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ইটের বিকল্প হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প দলিলে প্রতিষ্ঠানের ব্লক ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, একনেকসহ বিভিন্ন সভায় পোড়ানো ইটের পরিবর্তে নদীর ড্রেজিং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বালি দিয়ে ব্লক তৈরি করে তা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন।

যানবাহনের কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এবং দূষণকারী মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনি ট্রাক ও অটোরিকশার নিঃসরণ মনিটরিং করে জরিমানা আদায় করছে। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইক্লিং কারখানা, স্টোন ক্রাশারসহ বায়ুদূষণকারী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ গত জুলাই ২৬, ২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিধিমালায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সভাপতিত্বে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বে জাতীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গাড়ীর কালো ধোয়া বিরোধী অভিযানে বিআরটিএ কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত রাস্তায় পানি ছিটানোসহ রাস্তার ধুলাবালি পরিস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পৌরবর্জ্য পোড়ানোর বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, অনাবৃত বা খোলা ট্রাকে মাটি, বালি, ময়লা পরিবহন যেন করতে না পারে সে বিষয়ে বিআরটিএ ও পুলিশ বিভাগ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফিটনেসবিহীন ও ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত হয়েছে এমন যানবাহনকে রাস্তা থেকে প্রত্যাহারের জন্য বিআরটিএ ও

পুলিশ বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বায়ুর মানমাত্রা পরিমাপ পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের গ্রহণযোগ্য উৎস এবং মাস/দিন ভেদে দূষণ মাত্রার তারতম্য নির্ধারণ বিষয়ক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সার্বিক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা শহরের চারপাশের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য করণীয় নির্ধারণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক একটি নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাকে এটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, ডিগ্রেডেড এয়ারশেড ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়নসহ সার্বিকভাবে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

এছাড়া আন্তঃসীমান্ত (transboundary) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ICIMOD, Head Quarters, Nepal G Regional Science Policy Dialogue (SPD) on AIR QUALITY MANAGEMENT IN THE INDO-GANGETIC PLAIN AND HIMALAYAN FOOTHILLS শীর্ষক আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রোগ্রামটি গত ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা মতে, দেশের বায়ুদূষণের প্রায় ৩০-৪০% দূষণ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আসে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশগুলিতে বায়ুদূষণকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে এবং বার্ষিক বায়ুমান (পিএম২.৫) প্রতি ঘনমিটারে হ্রাস করার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে একটি রোডম্যাপ গত ১৫/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন ও স্বাক্ষর করে। যার মাধ্যমে এশিয়ার এই চারটি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ুদূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃসীমান্ত উভয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চল উপকৃত হবে।

নেদারল্যান্ডস সম্পর্কিত কিছু কথা

দিলরুবা আক্তার*

বিগত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সময়মত প্রোমোশন না হওয়ায় চরম অভিমানে আমি নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বিখ্যাত অরেঞ্জ নলেজ স্কলারশিপ নিয়ে IHE Delft Institute for Water Education-এ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে (Environmental Science with specialization in Environmental Science and Technology) দেড় বছর মেয়াদি মাষ্টাস কোর্স সম্পন্ন করার নিমিত্ত বিগত ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর এ পাড়ি দিলাম স্বপ্নের দেশ নেদারল্যান্ডসে। যদিও ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমার প্রমোশন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চাকুরীর সুবাদে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ হলেও, পরিবার পরিজন এবং দেশ ছেড়ে দীর্ঘ সময় বিদেশের মাটিতে অতিবাহিত করার মতো পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা। তার ওপরে দীর্ঘ ১৬ বছর বিরতির পর পড়ালেখার নতুন কৌশলে নিজেকে খাপ খাওয়ানো এবং দুই সন্তানের (মেয়ে ১২ বছর এবং ছেলে ৬ বছর) জন্য চরম মানষিক পীড়ায় যখন ভূগছিলাম, ভ্রমণ পিপাসু এই মন নিজেকে ব্যস্ত রাখার নতুন পন্থা আবিষ্কার করলেন। আর তা হলো বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখার মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার আগে দেশটি সম্পর্কে সামান্য না বললেই নয়।

নেদারল্যান্ডস অনেকের নিকট হল্যান্ড নামেও পরিচিত। ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিদেশী অঞ্চলসহ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ। এটি বারোটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি প্রদেশ প্রশাসনিকভাবে একজন রাজার কমিশনারের অধীনে পরিচালিত হয়। অনানুষ্ঠানিকভাবে, লিম্বুর্গ প্রদেশে, এই পদটির নাম গভর্নর। সমস্ত প্রদেশ পৌরসভায় (খেমেন্তে) বিভক্ত, যার সংখ্যা ৩৪২ (২০২৩ এর হিসাব অনুযায়ী)। এছাড়াও দেশটি ২৫টি water district-এ বিভক্ত যা একটি করে water board (ডাচ ভাষায় ওয়াটারচ্যাপ নামে পরিচিত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি water board-এর wastewater treatment-সহ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে। প্রতিটি বাড়ি এবং শিল্প কারখানার তরলবজ্য পরিশোধনের জন্য প্রতিটি water district-এ একটি করে কেন্দ্রীয় sewage treatment plant রয়েছে। শিল্প কারখানার তরলবর্জ্য sewage লাইনে discharge করার পূর্বে treatment-এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মানমাত্রায় নামিয়ে আনতে হয়। ডাচ water board-গুলি এখনও বিদ্যমান বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক সত্ত্বাগুলির মধ্যে একটি। প্রতি চার বছর অন্তর

*উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

water board-এর সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দেশি বিদেশি নাগরিকের এই ভোটে অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে প্রদেশীয় কমিশনার নির্বাচনে শুধুমাত্র নেদারল্যান্ডসের নাগরিকদের সুযোগ রয়েছে। ২০২৩ সালের Delft water board-এর নির্বাচনে আমিও ভোটার হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভোটে অংশগ্রহন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নতদেশের ভোট গ্রহণের অবস্থা অবলোকন করা। নিয়মমত ডাকযোগে চিঠির বক্স হতে প্রাপ্ত ভোটার আইডি নিয়ে খেমেন্তেতে বা Delft পৌরসভায় উপস্থিত হলাম। শান্ত পরিবেশে সবাই লাইন ধরে ভোট প্রদান করছেন। ভোট গ্রহণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ শুধু আইডি চেক করছেন আর সেই মোতাবেক ভোট প্রদানের ভ্যালেট পেপার দিচ্ছেন। সেখানে নেই কোন হট্টগোল এবং নেই কোন অরাজকতা।

দেশটির সরকারী ভাষা ডাচ, তবে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেন্স ও স্পেনিশ ভাষা শেখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। ফলে, প্রায় অধিকাংশ জনগন ইংরেজি ভাষাসহ অন্য ভাষাসমূহ অনেকটা রপ্ত করে থাকে, যদিও চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডাচ ভাষার প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমুহ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। নেদারল্যান্ডসের পূর্বে জার্মানির সীমানা এবং দক্ষিণে বেলজিয়াম, উত্তর ও পশ্চিমে একটি উত্তর সাগরের উপকূলরেখা। এটি উত্তর সাগরে যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং বেলজিয়ামের সাথে সামুদ্রিক সীমানায় সংযুক্ত রয়েছে। নেদারল্যান্ডের চারটি বৃহত্তম শহর হল আমস্টারডাম, রটারডাম, দ্য হেগ এবং উট্রেক্ট। আমস্টারডাম হল দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর এবং নামমাত্র রাজধানী। শিফোল হলো নেদারল্যান্ডসের ব্যস্ততম বিমানবন্দর এবং ইউরোপের তৃতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর। অপরদিকে হেগ এ স্টেট জেনারেল, ক্যাবিনেট এবং সুপ্রিম কোর্ট অবস্থিত। এছাড়া, রটারডাম বন্দর ইউরোপের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দর নামে পরিচিত। নেদারল্যান্ডস হল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোজোন, জি ১০, ন্যাটো, ওইসিডি এবং ডব্লিউটিও, সেইসাথে শেনজেন এলাকা এবং ত্রিপক্ষীয় বেনেলাক্স ইউনিয়নের একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এদেশের হেগকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর অবস্থিত। নেদারল্যান্ডস বিশ্বের ১৬তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিতীয় সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৩১ জন লোকের বসবাস (১,৩৮০ জন/বর্গ মাইল)। তা সত্ত্বেও, উর্বর মাটি, মৃদু জলবায়ু, নিবিড় কৃষি, এবং উদ্ভাবনশীলতার কারণে আর্থিক মূল্যের দিক থেকে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য ও কৃষি পণ্য রপ্তানিকারক দেশ। গবাদি পশুপালন থেকে শুরু করে অন্যান্য কৃষিকাজের প্রতি দেশটির যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে, যা বিভিন্ন শহর ভ্রমনের সময় নির্দিষ্ট স্থানে গ্রীণ হাউজ এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের সমারোহ দেখা যায়।

নেদারল্যান্ডসের আক্ষরিক অর্থ "নিম্ন দেশ" এর নিম্ন উচ্চতা এবং সমতল ভূ-সংস্থানের রেফারেন্সে, দেশটির প্রায় ২৬ শতাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে অবস্থিত। ১৪ শতকে শুরু হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের ফলস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচের অধিকাংশ এলাকা বর্তমানে পোল্ডার নামে পরিচিত। ১৫৮৮ সালে রিপাবলিকান আমলে নেদারল্যান্ডস রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মহত্ত্বের এক অনন্য যুগে প্রবেশ করেছিল, যা ইউরোপ এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে স্থান পায়। এই সময়কাল ডাচ স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। এই সময়ের মধ্যে, ডাচ ট্রেডিং কোম্পানি, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, সারা বিশ্বে উপনিবেশ এবং ট্রেডিং পোস্ট স্থাপন করে। নেদারল্যান্ডসে ১৮৪৮ সাল থেকে একক কাঠামো সহ একটি সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিরাজ করছে। দেশটির ঐতিহ্য এবং সামাজিক সহনশীলতার একটি দীর্ঘ রেকর্ড রয়েছে।

মডিউল ২ এবং ৯ এর সুবাদে water quality and quantity tests এর উদ্দেশ্যে Vesdre, Rhine এবং Rur catchment হতে পানির নমুনা সংগ্রহের জন্য জার্মানীর সীমান্ত শহর আখেন ভ্রমণ করা হয়। মাঠপরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে প্রক্রিয়া এবং কারণগুলি catchment-এর নদীগুলির পাশাপাশি জলের পরিমাণ ও গুণগতমানকে প্রভাবিত করতে পারে সেইসাথে নদীগুলির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার জন্য আন্তঃসীমান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে কাজ করছে তা জানা। ক্যাচমেন্টের উজানের অংশগুলি বনভূমি এবং তৃণভূমি নিয়ে গঠিত যেখানে নিম্নধারার অঞ্চলগুলি প্রধানত ফসলী জমি এবং বসতিপূর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত। দুই মডিউল মিলে দীর্ঘ ৪ সপ্তাহ অতিবাহিত করা হয় সীমান্ত শহরগুলোতে এবং জার্মানী, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডের বিভিন্ন আন্তসংযোগ প্রতিষ্ঠান যেমন: Blauwe Kamer - Utrechts Landschap, The International Commission on Protection of the Rhine (ICPR), Eifel National Park, Julich Research center, Meus-Maas Commission, এবং Waterschap-Limburg পরিদর্শনে। Blauwe Kamer হলো নেদারলেন্ডসের উট্রেক্ট-এ অবস্থিত প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা যা ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে গ্রীষ্মকালীন ডাইকটি খোলা হয়েছিল যাতে নিম্ন ধারার অঞ্চলগুলি নদীর জল দ্বারা প্লাবিত হতে পারে। এভাবে প্রকৃতি ক্রমাগত গতিশীল এবং বিকশিত হতে পারে। ICPR 1950 সালে স্থাপিত হয়েছিল যা ৯ সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। ICPR কমিশন নদীর জলবিদ্যা এবং জলের গুণগতমান নিরীক্ষণের জন্য নদীর তীরবর্তী মনিটরিং স্টেশনগুলি ব্যবহার করে থাকে। মনিটরিং এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সদস্য দেশগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জলের পরিমান ও গুণগতমান রক্ষা করে। এভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখছেন।

এবার ব্যক্তিগত ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলা যায়, আসলে নতুন কোন স্থানে ভ্রমণ করা আমার শখ বলতে পারেন। Delft শহরে আমার বসবাস হলেও শখের বশিভূত হয়ে অনেক শহরের অনেক জায়গায় আমার ভ্রমণ করা হয়েছে যেমন: আমস্টারডাম, রটারডাম, হেগ, উট্রেক্ট, লেইডেন, ওয়াখিনেনখেন, হারলেম, এবং ভ্লার্ডিনখেন উষ্ট, নুর্ডউইকারহাউট, হুফড্রপ, শেভিনেনজেন নুর্ড, ডাচ ভাষায় আরও অনেক কঠিন কঠিন নামের স্থানে। প্রতিটি শহর অতিমাত্রায় সাজানো গুছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সবুজের ছড়াছড়ি। সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরশীলতার জন্য দেশটি তার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন। উদাহরণস্বরপ বলা যায় বিখ্যাত সেই টিউলিপ ফুলের বাগানের কথা নাম তার কেউকেনহফ। প্রতিবছর এপ্রিল-মে মাসে হাজার হাজার বিদেশি পর্যটক আসেন এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘুরে দেখতে। স্কুল থেকে প্রতিবছর এই বাগান ভ্রমণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় একটি নির্দিষ্ট মূল্যের প্রবেশ ফি প্রদানপূর্বক। বিগত ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে আমার স্কুলের আয়োজনে আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল সেই বিখ্যাত ফুলের বাগান পরিদর্শন করার। চারদিকে নানা প্রজাতির নানা রঙের টিউলিপ ফুলের ছড়াছড়ি। কি অপূর্ব সেই টিউলিপের সমারোহ।

অপরদিকে, নেদারল্যান্ডসের উত্তর-পূর্ব অংশের একটি খাঁটি গ্রাম গিথোর্ন যা Overijssel নামক প্রদেশে অবস্থিত। এটি ডাচ ভেনিস নামে পরিচিত। গিথোর্ন গ্রামে গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। আপনি নৌকা, সাইকেল বা শুধু হেঁটে গিথোর্নে নিজেকে পরিবহন করতে পারেন। গ্রামটিতে রাস্তা নেই কারণ এতে সুন্দরখাল রয়েছে যা একে অপরের সাথে সংযুক্ত, যা আপনি কাঠের খিলান সেতুতে পার হতে পারেন। গিথোর্ন তার অনেকগুলি খড়ের কুটিরগুলির জন্যও জনপ্রিয়, যা এটিকে রূপকথার মতো অনুভূতি জাগায়। প্রতিবছর ১ মিলিয়ন দর্শনার্থী নেদারল্যান্ডসের এই ছোট গাড়ি-মুক্ত গ্রাম দেখতে আসেন। বেশিরভাগ পর্যটকরা গিথোর্ন গ্রাম ঘুরে দেখতে একটি নৌকা ভাড়া করে। পরিবারসহ এই গ্রাম দর্শনের সুযোগ আমারও হয়েছিল বিগত ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করে এই গ্রাম ঘুরার পর যেটি উপলব্দি করলাম, তা হলো সে দেশের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে এই গ্রামের আদিরুপ এখনও বিদ্যমান রয়েছে ফলে পর্যটকরা অতি উৎসাহ নিয়ে সে গ্রাম দেখতে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে এখনও ঐ গ্রামের কোন স্থাপনা মেরামতের প্রয়োজন হলে, বাহিরের ডিজাইনের কোনরকম পরিবর্তন করার বিষয়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আমার জানামতে নেদারল্যান্ডসের সরকার নাগরিক সেবাও প্রদান করেন অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বেশি। যেমন কোন নাগরিক যদি স্বল্প আয়ের হন, একটি নির্দিষ্ট পরিমান আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন বাসা ভাড়া প্রদানের জন্য অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া ভাতা পান। এই ভাতা দেশি-বিদেশী সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। আর একটি ভ্রমণে গিয়ে নেদারলেন্ডস এর সরকার ও সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সাধারণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বহুগুনে বেড়ে যায়। একদা রটারডাম বন্দর দেখার জন্য Delft হতে যথারীতি যাত্রা শুরু করলাম ট্রেনে। যখন ট্রেনের যাত্রা শেষ হলো ভ্লার্ডিনখেন উষ্ট এ। তারপর সেখান থেকে মাইক্রোবাস বা ছোট বাসে করে রটারডাম বন্দরে পৌঁছাতে হবে। সেইদিন সেখানে ছিল যানবাহন হরতাল। আমিও ছিলাম নাছোড় বান্দা সেই বন্দরে যাবোই সেদিন। আসল উদ্দেশ্য ছিল এরকম পরিস্থিতিতে সেদেশের জনগন কিভাবে মোকাবেলা করেন তা দেখা অর্থাৎ সেদেশের অল্টারনেট ব্যবস্থাগুলো দেখা। হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছু সংখ্যক লোক একটি ছোট বাসে উঠছেন। আমিও যথারীতি সে বাসে উঠলাম। তখনই বাসের চালক জানালেন তিনি আমাকে বাসে চড়াতে পারবেন না কারণ আমার নাম তার লিষ্টে নেই। তখন জানতে পারলাম যানবাহন হরতালের সময় ওখানে যেতে হলে আমাকে পূর্বেই রিজারভেশন দিতে হবে। আমি চালককে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে আমি রিজারভেশান দিব। বাসের চালক জানালেন ওয়েবসাইট ভিজিট করে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে রিজার্ভ করা যেতে পারে। যথারীতি আমি ফোন করলাম এবং অপর পাশ থেকে একজন ভ্রদ্রমহিলার প্রতিউত্তর শুনতে পেলাম, তখন প্রায় সকাল ৬:১৫ ঘটিকা। ভ্রদ্রমহিলা জানালেন পরবর্তী বাস সকাল ৭:০০ টায় আমাকে পিক করবে। যদিও সকাল ৭:০০ টার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি দেখতে পেলাম ফোন করার ১৫ মিনিট পর একটি বাস এসে স্টপিজে দাড়িয়ে আছে। আমি উৎসুক হয়ে বাসটিতে উঠলাম এবং দেখতে পেলাম একজন ভ্রদ্রমহিলা চালকের আসনে বসা, আমি তাকে অভিবাদন জানানোর পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি ইতোমধ্যে স্ক্রীনে আমার নাম দেখতে পেলাম। আর কোন যাত্রী না থাকায় চালক আমাকে নিয়েই যাত্রা শুরু করলেন অর্থাৎ আমাকে সেবা প্রদানের জন্য ঐ বাসটি এসেছে। দীর্ঘ ৩০-৪৫ মিনিট বাস চালানোর পর গন্তব্যে পৌছালাম এবং চালককে জিজ্ঞেস করলাম অভি চীপ কার্ড হতে ভাড়া কত কাটতে পারে এতটুকু ভ্রমণের জন্য। প্রতি উত্তরে তিনি জানালেন একজন যাত্রী যদি ট্রেন ব্যবহার করে তবে ভাড়া হবে ২.৫০ -৩.০০ ইউরো যা নিতান্ত্য কম। ভ্রমণ শেষে একই প্রকারে শুধু আমাকে নিয়ে বাস যাত্রা শুরু করলেন যথাস্থানে। যাই হোক সবমিলিয়ে সরকারের নাগরিক সেবার অনেক উদাহরণ রয়েছে যা লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। অবশেষে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম সেই নেদারল্যান্ডস সরকার এর প্রতি, আমাকে উক্ত দেশ সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি হেবা দলিল

খন্দকার মাহমুদ পাশা*
আফরোজা ইসলাম শশী**

গ্রহীতা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারীসহ পৃথিবীর সকল দেশে বসবাসকারী ভবিষ্যৎ বাঙালি জাতি।

দাতা: বর্তমান বাঙালি জাতি।

অত্র হেবানামায় আমরা বর্তমান বাঙালি জাতি জন্মসূত্রে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বলে বাংলাদেশের দখলদার নিয়ত আছি। হে ভবিষ্যৎ বাঙালি জাতি, তোমাদের আমরা এই দেশ সম্পূর্ণরূপে দিয়ে যাচ্ছি।

তোমরা কি জানো, তোমাদের উন্নত এক বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার কথা? সরকার ভবিষ্যতের তোমাদের কথা ভেবে এমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা আমাদের বর্তমান চাহিদা পূরণ করাসহ, তোমাদের প্রজন্মের চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হবে। 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় না করলে উন্নয়ন কখনোই টেকসই হবে না।"

তাই, পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য 'জাতীয় পরিবেশ পদক' প্রদান করা হয়। আমাদের প্রজন্মের বর্তমান সরকার পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধানে "পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন"কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত করে অনুচ্ছেদ ১৮ক সংযোজন করেছে। পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধনী ২০১০)"। এই আইন ছাড়াও তোমাদের জন্য আমাদের রেখে যাওয়া বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় আরো অনেক আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১. জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮;
২. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ (২০১৪ সংশোধনীসহ);
৩. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬;
৪. চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮;
৫. বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১;
৬. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২;
৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬;
৮. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭;
৯. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯;
১০. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১;
১১. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১;
১২. বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২;
১৩. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩; এবং অন্যান্য আরো অনেক আইনকানুন

তোমরা কি জানো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নত বিশ্বের উদাসীনতার কারণে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি। কিন্তু তারপরও তোমাদের গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের এই বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দ্বারা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। তোমাদের জন্য এমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার জন্য জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে 'Champions of the Earth' খেতাবে ভূষিত করেছে।

*সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
**ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), প্রাইমারি টিচার্স ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, মানিকগঞ্জ

পরিবেশ দূষণরোধে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যা-ই করুক না কেনো, পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বপ্রথম দেশের সবাইকে সচেতন হতে হবে। আর পরিবেশ নিয়ে সবাইকে সচেতন করতে হলে সুশিক্ষা প্রদানের কোনো বিকল্প নেই।

তাই, তোমাদের সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার কী কী করেছে তাই তোমাদের বলছি। প্রাথমিক স্তরে শারীরিক শিক্ষা নামক নতুন একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রথম প্রান্তিক যোগ্যতা হচ্ছে "ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা ও পরিবেশ উন্নয়নে আগ্রহী করে তোলা"।

সমাজ, পরিবেশ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় নামক বইয়ে অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার পরিবেশ দূষণের কারণ জানা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাকে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। একই ভাবে প্রাথমিক বিজ্ঞানে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে পরিবেশ, পরিবেশের উপাদান, পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া; আমাদের পরিবেশে জড় ও জীব সম্পর্কে জানা; পরিবেশের উপাদান হিসেবে পানির গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে পানির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা; পরিবেশের উপাদান হিসেবে মাটির গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে মাটির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা; পরিবেশের উপাদান হিসেবে বায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে বায়ুর উপাদান যথাযথ ব্যবহার করা ও দূষণ রোধ করা; আবহাওয়া ও জলবায়ু, এদের আন্তঃসম্পর্ক এবং নিয়ামক সম্পর্কে জানা; জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাসহ অন্যান্য প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য এই সকল প্রান্তিক যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু শিশুদের পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৯ সনের ২৭শে জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত পরিপত্র জারি করেছে। জারিকৃত পরিপত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা, প্রতিষ্ঠানের বহিরাঙ্গনের পরিচ্ছন্নতা এবং সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া এ সকল কাজে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াসে পুরস্কার প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। একইভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরও সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ প্রসঙ্গে ২০১৬ সালের ৭ই জানুয়ারি পরিপত্র জারি করেছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটার সাথে সাথে পরিবেশ সুরক্ষার মনোভাব গড়ে তোলার নিমিত্ত এমন পরিপত্র জারি হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপরিউক্ত পদক্ষেপের কারণে এখন আর তোমাদের কাছে করা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের অঙ্গীকার তাঁর একার নয় -আমরা পুরো বাঙালি জাতি এখন তোমাদেরকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি,

"চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

এতদার্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞান বিনা প্ররোচনায় অত্র হেবা দলিল সম্পাদন করলাম।

ইতি
বর্তমান বাঙালি জাতি
তারিখ: ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ মোতাবেক ৫ই জুন ২০২৩

তপসীল: স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বন সৃজনে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষণা সাফল্য

মোহাঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া*

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য কাঠ, জ্বালানী, খুঁটি, পশু খাদ্য এবং কুটির শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১৬ ভাগ হলেও বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৯ ভাগ। একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ ভূমিতে বন ও গাছপালা থাকা অপরিহার্য।

উপকূলীয় এলাকা দেশের মোট আয়তনের ৩০%। মোট জনসংখ্যার ২৮% লোক এ অঞ্চলে বসবাস করে। উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৭১০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। অবস্থানগত কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছরই কম-বেশি দূর্যোগ কবলিত হয়। উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৬৬ সন হতে উপকূলীয় চর বনায়নের কাজ শুরু করে। বন বিভাগ এ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ২,০৯,১৪০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করেছে। এ বনের ৯৪% হলো কেওড়া প্রজাতির একক বন। উপকূলীয় এ বন বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট (পিটিইউ) বিভাগটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার কৃত্রিম উপায়ে সৃজিত বনাঞ্চলে এবং উপকূল বরাবর জেগে উঠা নতুন চরে, বেড়িবাঁধে, বসতবাড়িতে, উঁচু হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে টেকসই বন সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন কৌশল, স্থান উপযোগী ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল, উপকূলীয় উঁচু ভূমির উপযোগী নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল, বেড়িবাঁধে রোপণের জন্য প্রজাতি নির্বাচন, উপকূলীয় এলাকায় ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতির বাগান সৃজন, বসতবাড়িতে কৃষিবন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং বাঁশ ও বেত প্রজাতি নির্বাচন বিষয়ক গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। উপকূলীয় টেকসই বন সৃজনে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য নিচে সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হলোঃ

১। প্রতিষ্ঠিত কেওড়া বনের অভ্যন্তরে স্থানোপযোগী অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল

কেওড়ার একক প্রজাতির বন সৃজনের ফলে উপকূলীয় এ বন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে কেওড়ার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে গাছ মরে যাওয়া উল্লেখযোগ্য। বনভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি, মাটি শক্ত হওয়া, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির অনুপস্থিতি এবং ম্যানগ্রোভ প্রজাতির রিজেনারেশন আশানুরূপ না হওয়ার ফলে বনের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয়। কাজেই একক কেওড়া বাগানের প্রতিকূল প্রভাব দুর করা এবং টেকসই লাগাতার বন সৃজনের লক্ষ্যে ৯-১২ বছর বয়সি কেওড়া বাগানের অভ্যন্তরে ১১ টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির আন্ডারপ্লান্টিং বাগান সৃজনের পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্লাবন উপযোগি যথা-৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস এবং

চিত্রঃ কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গড়ানের আন্ডারপ্লান্টিং বাগান ও সুন্দরী গেওয়ার রিজেনারেশন (সোনার চর, মার্চ-২০২৩)

চিত্রঃ সুন্দরীর রিজেনারেশন (সোনার চর, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, সেপ্টেম্বর-২০২২)।

চিত্রঃ সুন্দরীর রিজেনারেশন (জাইলার খাল, চর কুকরী-মুকরী, ভোলা মার্চ-২০২৩)

*গবেষণা কর্মকর্তা, প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, বরিশাল

১২ মাস প্লাবিত স্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন করা হয়। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, খলসী, সিংড়া, হেঁতাল এবং গোলপাতা উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক বাগান বীজের উৎস হিসাবে কাজ করছে। প্রাকৃতিকভাবে গেওয়া, সুন্দরী, হেঁতাল, খলসি, পশুর ইত্যাদি প্রজাতির রিজেনারেশন পরীক্ষামূলক প্লট এলাকার বিভিন্ন চরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরীক্ষার এ ফলাফল উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি ঘটাবে এবং স্থায়ী ম্যানগ্রোভ বন সৃজনের মাধ্যমে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী অটুট রাখতে সহায়ক হবে।

২। উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচুভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল

উপকূলীয় উঁচু বনভূমি যেগুলো বছরের কম সময় প্লাবিত হয় সে সমস্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য ক্রমান্বয়ে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে পলি পড়া এবং পশুচারণের ফলে এ অঞ্চলের অনেক বনাঞ্চলের জমি শক্ত, স্থায়ী ও অনেক উঁচু হয়ে গেছে। এ সকল জমি সাধারণতঃ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় না, তবে বছরের ২/৩ মাস অল্প সময়ের জন্য প্লাবিত হতে দেখা যায়। ফলে এখানকার কেওড়া প্রজাতির গাছের বৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে কেওড়া গাছ মারা যাচ্ছে। কাজেই উক্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য আর উপযুক্ত থাকছে না। এ সমস্ত ভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির (নন-ম্যানগ্রোভ) বাগান সৃজন করা যায় কিনা তা যাচাই এর জন্য একটি পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৩ টি নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন করা হয়। উক্ত গবেষণায় উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচু জমিতে ৬ টি মূলভুমির বৃক্ষ প্রজাতি লবণাক্ত সহিষ্ণু ও উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রজাতিগুলি হলো ঝাউ *(Casuarina equisetifolia)*, রেইন ট্রি *(Samanea saman)*, খইয়া বাবলা *(Pithecellobium dulce)*, সাদা কড়ই *(Albizia procera)* কালো কড়ই *(Albizia lebbeck)* এবং বাবলা *(Acacia nilotica)*। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার অনুৎপাদনশীল উঁচুভূমি বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব যা এ এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩। উপকূলীয় বসতবাড়ীতে কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন

বসতভিটায় বনায়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বসতভিটাগুলিতে বনজ, ফলদ, জ্বালানী কাঠ ও সবজির আবাদ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সকল বসতভিটায় কম-বেশী কৃষি-বনের চাষাবাদ হয়ে থাকে।কিন্তু উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বসতভিটাগুলি নতুন হওয়ায় সাধারণতঃ বৃক্ষশুন্য বা কম গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। সেখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র এবং তারা কৃষি কাজ, শ্রম বিক্রি বা মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের বসতবাড়ীতে কৃষি-বন চর্চার মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা যায় কিনা এবং বসতবাড়িগুলির ভেজিটেশন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বসতবাড়িগুলোতে আটটি কাষ্ঠ জাতীয় বনজ বৃক্ষ এবং ১১টি ফলদ

চিত্রঃ উপকূলীয় বসতবাড়িতে ভেজিটেশন বৃদ্ধি (চর নজির, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, সেপ্টেম্বর-২০২২)

বৃক্ষের চারা সহ মোট ১৯ প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় এবং মৌসুমী শাক-সবজির আবাদ করা হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, বসতভিটায় রোপিত কাষ্ঠ জাতীয় গাছের মধ্যে রেইন ট্রি, মেহগনি, আকাশমনি, নিম এবং কালো কড়ই এর বেঁচে থাকার হার আশাব্যঞ্জক এবং ফল জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, পেঁয়ারা এবং তেতুলের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক। এর ফলে বসতভিটায় গাছপালার আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বসতভিটায় শাক-সবজি আবাদ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি আয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

৪। বাংলাদেশের উপকূলীয় বেড়ী বাঁধে রোপণের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন

বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের ঢালুতে ৩৭ টি বনজ ও ফলদ বৃক্ষ প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়। উপকূলীয় বেড়িবাঁধে স্থানোপযোগী গাছ নির্বাচন করার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় লবণাক্ততার তারতম্য রয়েছে। বিভিন্ন লবণাক্ততা মাত্রা ভেদে পূর্ব হতে পশ্চিম উপকূল বরাবর গাছের বৃদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। অঞ্চলভেদে বেড়ী বাঁধ বনায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রজাতিগুলি উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়ঃ-

পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলঃ এ এলাকার বেড়ী বাঁধে ১৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। প্রজাতিগুলির বর্ধন হার অনুসারে আকাশমনি *(Acacia auriculiformis)*, রেইন ট্রি *(Samanea saman)*, ইপিল-ইপিল*(Leucaena leucocephala)*, ঝাউ *(Casuarina equisetifolia)* এবং নারিকেল (*Cocos nucifera*) উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়।

মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলঃ এ অঞ্চলে ২০ টি বিভিন্ন মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন করা হয়। তন্মধ্যে রেইন ট্রি, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম *(Acacia mangium)*, আমলকি *(Embelica officinalis)*, খেজুর (*Phoenix sylvestris)* এবং নারিকেল উপযোগী প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলঃ এখানে ৩১ টি বিভিন্ন প্রজাতির বাগান উত্তোলন করা হয়। তন্মধ্যে ঝাউ, আকাশমনি, বাবলা (*Acacia nilotica)*, অর্জুন *(Terminalia arjuna*), রেইন ট্রি, খইয়া বাবলা *(Pithecellobium dulce)* এবং নারিকেল সবচেয়ে সফল হিসাবে পাওয়া যায়।

৫। উপকূলীয় অঞ্চলের অগ্রতট *(foreshore)* এলাকায় পাম প্রজাতির বনায়ন কৌশল

বাংলাদেশের উপকূলীয় অগ্রতট এলাকায় অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচু ভূমি আছে যেখানে বছরে অন্ততঃ তিন মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এ সমস্ত ভূমিগুলি ম্যানগ্রোভ প্রজতির বাগান সৃজনের জন্য অনুপযুক্ত এবং অনুৎপাদনশীল। উক্ত ভূমিতে মূলভূমির ৪ টি পাম প্রজাতি যথা- তাল, নারিকেল, খেজুর এবং সুপারির বাগান সৃজনের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। চারা রোপণের জন্য বিভিন্ন মডেলের ঢিবি প্রস্তুত করা হয় যাতে জোয়ারের পানিতে চারা ডুবে না যায়। বিভিন্ন আকৃতির ঢিবিতে ৪ টি পাম প্রজাতির বর্ধণ এবং জীবিতের হার খুবই ভাল পাওয়া যায়। উপকূলীয় এলাকার ভূমির ক্ষয়রোধ, ঝড় ও জ্বলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষায় এ প্রকারের বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬। ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতমানের বীজের উৎসের উন্নয়ন

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সৃজিত বাগানের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় কম। এর অন্যতম কারণ হলো উন্নতমানের বীজ ব্যবহার না করা। এ জন্য দেশের উপকূলীয় এলাকার পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলে বীজ উৎপাদন এলাকাপ্রতিষ্ঠা এবং ভুমি উপযোগী উন্নতমানের বীজের উৎস তৈরী করা হয়। প্রত্যেক বীজ উৎপাদন এলাকা হতে সেখানের স্ব স্ব এলাকার অভিযোজনের উপর ভিত্তি করে দুই ধরণের বীজের উৎস নির্বাচন করা হয়েছে যথা- উত্তম গাছের বীজের উৎস এবং নির্বাচিত গাছের বীজের উৎস। বাগানের অনেক গাছের মধ্য থেকে উত্তম গাছগুলিকে ভাল বীজের উৎস হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ফলে তাঁদের প্রতিকুল অবস্থায় টিকে থাকার বাড়তি ক্ষমতা আছে। এসব এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বাগান উত্তোলন করলে বাগানের উৎপাদন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, উত্তম গাছের বীজ থেকে সৃজিত বনের উৎপাদন সাধারণ গাছের বীজ অপেক্ষা প্রায় ৪ গুন বেশি।

৭। উপকূলীয় এলাকার উঁচুভূমি, বেড়িবাঁধে এবং বসতবাড়িতে রোপণের জন্য ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতভিটা, উপকূলীয় বেড়িবাঁধে, রাস্তারধারে, উপকূলীয় উঁচু ভূমিতে ঔষধি বৃক্ষের চাষাবাদের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় বৃক্ষ প্রজাতি ঔষধি উদ্ভিদের ১৪ টি প্রজাতির মধ্যে পূর্ব উপকূলীয়

চিত্রঃ উপকূলীয় বেড়িবাঁধে বৃক্ষ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদের বাগান (হরিদ্রাখালী, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, সেপ্টেম্বর-২০২২)।

চিত্রঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড এলাকার বগাচত্বর বেড়িবাঁধে উত্তোলিত ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতির বাগান (ছবি নভেম্বর, ২০১৮)।

এলাকায় অর্জুন *(Terminalia arjuna)*, কদম *(Neolamarckia cadamba)*, শিমুল *(Bombax ceiba)*, খয়ের *(Acacia catechu)*, কাঠবাদাম *(Terminalia catappa)*, নিম *(Azadirachta indica)* প্রজাতির বৃক্ষ প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত হিসাবে সনাক্ত করা হয়। অন্য দিকে পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় খয়ের, অর্জুন ,বকাইন (ঘোড়ানিম *Melia azedarach*), ছাতিয়ান *(Alstonia scholaris)*, শিমুল, পুনিয়াল *(Callophylum inophylum)*, পিতরাজ *(Aphanamixis polystachya)*, হরিতকি *(Terminalia chebula)*, সোনালু (*Cassia fistula)*, বহেরা *(Terminalia belerica)*, কদম এবং জাম *(Syzygium cumini)* প্রজাতির বৃক্ষ প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। গবেষণার এ ফলাফল দেশের ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বন সৃজনে ভূমিকা রাখবে।

৮। উপকূলীয় বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষ

উপকূলীয় বসতবাড়ীতে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলনপূর্বক বাঁশ চাষে আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া গিয়েছে। গবেষণায় উপকূলীয় বসতভিটায় রোপণের জন্য বাংলা *(Bambusa. vulgaris)* ও বরাক *(B. balcooa)* বাঁশ উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। গবেষণার এ ফলাফল কৃষকদের বসতভিটায় বাঁশ চাষে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। বসতভিটায় বাঁশ আবাদ করে কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি আয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। অন্যদিকে উপকূলীয় বসতবাড়িতে জালি বেত *(Calamus tenuis)* এবং কেরাক বেত *(C. viminalis)* চাষাবাদ বিষয়ক অপর একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় উপকূলীয় বসতভিটায় বেত চাষে আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া যায়। উন্নত পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রজাতির বেত চাষ করলে উপকূলীয় এলাকায় বেতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৯। ফাঁকা ও উঁচু হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশ ও বেত প্রজাতির বনায়ন

চিত্রঃ ফাঁকা হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে মাউন্ডের উপর বাংলা/বাজ্যা বাঁশের ঝাড় (চর লতির, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, সেপ্টেম্বর-২০২২)।

চিত্রঃ কেওড়া বনের অভ্যন্তরে জালি বেতের পরীক্ষামূলক বাগান (চর লতির, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, সেপ্টেম্বর-২০২২)।

চিত্রঃ পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীর চর লতিরে ফাঁকা হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে উত্তোলিত বাঁশের বাগান (ছবি সেপ্টেম্বর ২০২২)।

সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ২১-৫৫ বছর বয়সের প্রায় ১, ২৬,০০০ হেক্টর কেওড়া বন ও ফাঁকা ভূমি আছে। এসব বন এবং ভূমি উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া জোয়ারের পানি দ্বারা বছরের খুব কম সময় প্লাবিত হয়ে থাকে। সমগ্র উপকূলীয় এলাকার এসব উঁচু হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের ফাঁকা স্থানে বাঁশ এবং কেওড়া বনের নীচে বেত প্রজাতির বনায়ন করে বনের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কেওড়া বনের অভ্যন্তরে উঁচু ও ফাঁকা হয়ে যাওয়া ভূমি যেখানে জোয়ারের পানি ৩-৫ মাস প্লাবিত হয় এমন স্থানে বাঁশের ২ টি প্রজাতি যথা বাংলা (*Bambusa vulgaris*) এবং বরাক (*Bambusa balcooa*) বাঁশ মিনিমাউন্ডের উপর এবং কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বেতের দুইটি প্রজাতি জালি (Calamus tenius) ও কেরাক (*Calamus viminalis*) বেতের পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করে সফলতা পাওয়া গিয়েছে। উপকূলীয় উঁচুভূমি ও কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশ ও বেত প্রজাতি নির্বাচন স্থায়ী বন সৃজনে, বনের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিসহ অধিক কার্বন শোষণে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। গবেষণার এ ফলাফল বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের পাশাপাশি বনের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বনের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং এ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপসংহার

গবেষণার এ ফলাফল উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বন সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশিপরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। উপকূলীয় সংবেদনশীল ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় জনপদ ও অবকাঠামো রক্ষায় গবেষণার এ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে আরও সবুজ, স্বাস্থ্যকর প্রকৃতি সৃষ্টিতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশ বিপন্ন যেভাবে

হাসান জাহিদ*

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষতিগ্রস্ততার বিচারে বিশ্বব্যাপী গবেষকগণ বাংলাদেশকে পোস্টার চাইল্ড 'Poster Child' আখ্যা দিয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানিসম্পদের ওপর নজিরবিহীন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। ফসলহানি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষিজমি গ্রাস, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, সেইসাথে অগণিত উদ্বাস্তু সৃষ্টি হবে। এরা কোথায়-কীভাবে পুনর্বাসিত হবে?

জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দিতে বাংলাদেশের একটি স্বীকৃত উপায় হলো অ্যাডেপ্টেশন বা খাপ খাইয়ে নেয়া। যে বিপুল জনগোষ্ঠি উদ্বাস্তু হবেন তারা কোথায়-কীভাবে অ্যাডেপ্টেড হবেন? খাপ খাওয়ানোর তো একটা সীমারেখা আছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দৃশ্যমান কুপ্রভাব হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোয় লবণাক্ততা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল এবং ভোলার মতো জেলায় লবণাক্ততা অনেকদিনের সমস্যা। সূত্রমতে, এইসব অঞ্চলে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা যায় যে, দৃশ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই লবণাক্ততা বাড়ছে এবং তাতে এখানকার কৃষিতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন এমনভাবে বাড়ছে যে, কোপেনহ্যাগেন ও প্যারিস চুক্তিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা সীমিত রাখার যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছিল তাতে আর কাজ হচ্ছে না।

১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের মানব-পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন। তখন স্লোগান ছিল "Only One Earth" বা আমাদের একটিই পৃথিবী। দীর্ঘ অর্ধশতক পরে ২০২২ আবার ফিরে এলো সেই একই থিম। ১৯৯২ সালে রিও আর্থ সম্মেলন ও পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক কনফারেন্স/ট্রিটি ও কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বশেষ কপ-২৭ অনুষ্ঠিত হয় মিশরের শার্ম এল-শেইখে ৬-১৮ নভেম্বর ২০২২। এতো সম্মেলন/ট্রিটি আর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর সেই একই স্লোগান ফিরে আসার সোজা অর্থ হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবনয়ন পরিস্থিতি ও পৃথিবীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি; বরং অবনতি হয়েছে।

প্যারিস সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনে নানা অ্যাকশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কপ-২৬ (UN Climate Change Conference of the Parties, Glasgow, 31 October–13 November 2021) অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে সই করা দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যেন না বাড়ে, তা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা নিতে একমত হয়েছিল।

২০১৯ সালের শেষ দিকে করোনাভাইরাস অতিমারির উত্থানের পর ২০২১ এ কপ-২৬ সশরীরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। চারটি লক্ষ্যকে সম্মেলনে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল:

- ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যতে নামিয়ে আনতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা

-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার করা, প্রতিরক্ষা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অবকাঠামো তৈরি ও কৃষি ব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

*কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, সার্টিফায়েড মেম্বার/পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, ইকো-ক্যানাডা

-এসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল করার জন্য উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা রাখা এবং

-জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করা

কপ ২৬ সম্মেলনে "গ্লোবাল গোল অন অ্যাডেপ্টেশন" সংক্রান্ত বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য "গ্লাসগো-শার্ম এল-শেইখ ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অন দি গ্লোবাল গোল অন অ্যাডেপ্টেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয় যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অ্যাডেপ্টেশন কার্যক্রমকে বেগবান করবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঘুরেফিরে সেই অ্যাডেপ্টেশনের বিষয়টিই বারবার উঠে আসছে। অ্যাডেপ্টেশনই বাংলাদেশের একমাত্র অপশন। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এতো মানুষ কোথায়-কীভাবে অ্যাডেপ্টেড হবে (তা নির্ভর করে অদূর ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ, তার ওপর)। অ্যাডেপশন বা খাপ খাইয়ে নিতে যে পরিকল্পনা, অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে, সেই বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আমাদের মিশন ও ভিশন হতে হবে।

বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বা কার্বন নিঃসরণ ঘটিয়ে আজকের বিশ্বকে বিপর্যস্ত করায় বাংলাদেশের কোনো দায়ভার নেই। কিন্তু ভঙ্গুর ভৌগোলিক অবস্থান ও নিম্নাঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ শিকার হচ্ছে উন্নত বিশ্বের লাগামহীন কার্বন নিঃসরণের কুফলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জন্য প্যারিস সম্মেলনের চুক্তি সুফল বয়ে আনত বিগত সাত বছরে। দৃশ্যত তা যখন হয়নি, তখন কপ-২৬ সামিট তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয় কিনা, সেটা সারা বিশ্বের মানুষের দেখার বিষয় ছিল। যদিও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমানোর উদ্যোগ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে যথেষ্ট নয়। তবু সেটা মন্দের ভালো।

এদিকে যথারীতি বড় রকমের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় কপ-২৭ সম্মেলন। জলবায়ু আলোচনায় যে বিষয়টি সবসময় প্রাধান্য পাওয়ার কথা, অর্থাৎ তাপমাত্রা কমিয়ে এনে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি কমাতে বিশ্বের ধনী ও প্রভাবশালী দেশগুলোর যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেবার কথা, তার সুরাহা এই সম্মেলনেও হয়নি। বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, গাছ লাগানো হলো, কিন্তু তার পরিচর্যা করা হলো না। বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমিয়ে আনার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সেই কাজটিই হচ্ছে না। গোড়ায় যে গলদ, তা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে লালন করা হয় বিশ্বের কতিপয় মহাশক্তিধর দেশগুলোর জন্যই।

মিশরে কপ-২৭ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে একটি তহবিল গঠন করার বিষয়ে চুক্তিতে সম্মত হয়েছে বিশ্বের দেশগুলো। কপ ২৬ এ 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' এর যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেখানে দরিদ্র দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে এলেও কোনো কোনো দেশের জন্য, বিশেষত বাংলাদেশের জন্য খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে। আবার সেই নেগোশিয়েশন, তদ্বির আর আশাহত হবার বিষয়টি তো রয়ে গেল। লস অ্যান্ড ড্যামেজের অর্থ আদায়ে বাংলাদেশকে যে জটিল মেকানিজম ও পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে হবে সেটি একটি জটিল পদ্ধতি।

তহবিল গঠনে 'সন্তুষ্ট' হলেও জলবায়ু মোকাবিলায় কোনো চুক্তি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ঝুঁকিতে থাকা দেশ এবং পরিবেশকর্মীরা।

বাংলাদেশের নদীমোহনা আর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে যথা–কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি, বরিশাল ও পিরোজপুর জেলায় তিন কোটিরও ওপরে লোক বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠ এক মিটার স্ফীত হলে তাদের ওপর নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। শত শত বর্গ কি.মি. উপকূলীয় ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল অধিকতর মাত্রায় প্লাবিত হবে।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে প্রধান প্রধান নদীর পানি হ্রাস পায়। নদীর ক্ষীণপ্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নদনদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দিচ্ছে–বর্তমান চালচিত্রে তা-ই ঘটছে।

ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)'র মতে উন্নয়নের ধারায় যদি কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনও সাধিত হয় তাহলেও আগামী শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হবে তার পরিমাণ হবে শিল্পবিপ্লবের পূর্বের মাত্রার দ্বিগুণেরও বেশি। আইপিসিসি'র হিসেব অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি থেকে ৪.৫ পর্যন্ত বাড়বে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই দূষণের শিকার। এর ওপর রয়েছে উজানে বাঁধ দেবার ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদীগুলোর অনেকগুলোই অব্যস্থাপনা ও মানবসৃষ্ট কৃত্রিম বাঁধের খেয়ালিপনার শিকার হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিস্তা ব্যারেজের কথা বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে উজানে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে তিস্তা এখন পানিশূন্য।

বাংলাদেশের পানিসম্পদের ওপর বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব, বহির্দেশীয় নদী বা নদী-অববাহিকার পরিবর্তন/কুফল, ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানি, দেশীয় প্রেক্ষাপটে পানির চাহিদা ও প্রাপ্তি–এসব বিশাল চ্যালেঞ্জ সামনে রেখেই পানিসম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ভাবতে হবে।

বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার কতগুলি জটিল ও দুরূহ ক্ষেত্র রয়েছে। এসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে খরার সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমবর্ধমান পানি চাহিদার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, আর্সেনিকদূষণ, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি। এছাড়া পানিসম্পদভিত্তিক পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা, বিশেষ করে মৎস্যসম্পদের এলাকাসমূহ এবং জলাভূমি এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে।

অন্যদিকে, জলাভূমি ভরাট করে বিবিধ প্রকল্প ও আবাসন প্রকল্প নির্মাণের যে প্রতিযোগিতা বর্তমানে চলছে, তাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আঘাত আসার পূর্বেই বাংলাদেশ নত হয়ে গেছে চূড়ান্ত শিকারে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়। বাংলাদেশ অতিকায় কোনো দেশ নয় যে, বিবিধ প্রকল্প ও আবাসন নির্মাণে এই দেশের ওপর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব পড়বে না।

বর্তমান প্রেক্ষিতে সরকার বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিভিন্ন বিষয় যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, অভিন্ন নদীপ্রবাহের পানির ভাগ-বাটোয়ারা বা নদী অববাহিকার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজটিকে অভাবিত জটিলতায় ফেলে দিয়েছে। সর্বোপরি, পানির বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাহিদার বিষয়টি তো রয়েছেই।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর, বিশেষত ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফল করা সম্ভব নয়। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-অভ্যন্তর ভাগের ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিব্যবস্থাপনা ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারেও সমান গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আশানুরূপ কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

বহুবছর যাবত মরণফাঁদ হয়ে আছে যে ফারাক্কা বাঁধ, তার সাথে অধুনা যুক্ত হয়েছে আরেকটি ভীতিকর বিষয়–তিস্তার পানি বন্টন না হওয়া।

তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। শুকনো মৌসুমে তিস্তার পানি শুকিয়ে যায় (এখন যা চলছে) এবং বাংলাদেশ অংশে তীব্র হারে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় মানুষের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। পরিবেশগত প্রভাবের কারণে এ পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের আশা, বাংলাদেশে পানির মাত্রা কমে যাওয়ার নেতিবাচক দিকগুলো মাথায় রেখে তিস্তার পানি বন্টনে সাম্যতা নিশ্চিতকরণ চুক্তিতে ভারত এগিয়ে আসবে।

নদীর পানি না পাওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ সেচের জন্য ভূপৃষ্ঠের গভীরের পানির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সূত্রমতে, সেচ প্রকল্পের জন্য তিস্তা বাঁধে ১০ হাজার কিউসেক পানি প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশ পাচ্ছে মাত্র ৪০০ কিউসেক।

২০১৪ সালে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুরের ৬৫ হাজার হেক্টর জমি সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। কিন্তু পানির অভাবে সেচ দেয়া সম্ভব হয় মাত্র ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাত্র ১০ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় ছিল। পানির অভাবে সেচের আওতায় আনার জন্য ক্রমেই জমির পরিমাণ কমিয়ে আনতে হচ্ছে। তিস্তা নদীর তীরে বসবাসরত হাজার হাজার মানুষ নদীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু নিয়মিতভাবে পানির মাত্রা কমতে থাকায় তাদের জীবিকা এখন হুমকির মুখে।

সমঝোতার মাধ্যমে পানিসম্পদ খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো কিছুটা দূর হলেও বাংলাদেশের জন্য পানিসম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার কাজটি অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। ২০০৮ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৫তম সার্ক সম্মেলনে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য কোনো তহবিল গঠন করা হয়নি। অথচ বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের জন্য এ ধরনের তহবিল গঠন জরুরি। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে ভারত নেপালের সঙ্গে পানিসম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে নেপালের ৪টি নদীতে (কর্নালি, পঞ্চেশ্বর, সপ্তকোসি, বুড়িগন্ধকি) স্টোরেজ ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ। কেননা, এসব নদী শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গার মোট প্রবাহের ৫৬ শতাংশ প্রদান করে। ভূটানের সাংকোশ নদীতে একটি বহুমুখি ড্যাম তৈরির চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর করে ১৯৯৩ সালে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সাড়ে ১২ লাখ একর জমি সেচ সুবিধা পায়। অথচ এই সাংকোশ নদী বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটি উপনদী। ভারতের সাথে ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বন্টনবিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের প্রথম ১১০ দিনে প্রায় ১ লাখ ৮ হাজার কিউসেক পানি কম পেয়েছে বাংলাদেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো কোনো দেশের পানিব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ আঘাত। দেশের অভ্যন্তরের নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে তা বিপর্যয় ডেকে আনবে নানা খাতে–কৃষি, মৎস্যসম্পদ, সুপেয় পানি ও ক্ষেত্রবিশেষে মরুময়তা কিংবা বন্যা। একদিকে পানিপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে গিয়ে লবণাক্ততায় বিপর্যস্ত হবে, অন্যদিকে বন্যার পর ফসলী জমি স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা হারাবে লবণাক্ততার কারণে, আর ক্রমে ক্রমে মরুময়তার কারণে মাটি স্বাভাবিক গুণাগুণ হারাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও তার কুপ্রভাব, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য কেন হুমকি হয়ে উঠল, কীভাবে হলো, আগামী পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখতে কী করে যেতে হবে বর্তমান পৃথিবীকে–এসব এখন বিপন্ন বিশ্ববাসীর সামনে ক্রসওয়ার্ড পাজল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবুও আমরা আশাবাদী, কার্বন নিঃসরণের বিষয়ে আগামী সম্মেলনে বিশ্বের ধনী-দরিদ্র দেশগুলো একমত হবে। শক্তিশালী ফান্ড গঠন করে কোটা সিস্টেমে বিপন্ন দেশগুলোকে ফান্ড ও প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করবে।

পরাশক্তিধর দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে খুব মাথা ব্যথা আছে বলে বোধ হয় না; তারা ব্যস্ত যুদ্ধের দামামা বাজাতে আর নিজেদের দায় অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে। তাই আমাদের দেশের বিপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী এখনই সার্বিকভাবে শর্ট টার্ম ও লং টার্ম সমন্বিত পরিকল্পনা নিতে হবে। আর তৎপর হতে হবে বিভিন্ন সম্মেলনে দেন-দারবার করে যত বেশি সম্ভব ফান্ড আদায় করে নিতে।

অনস্বীকার্য যে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও পরাশক্তির দেশগুলো বিলাসিতায় ও আরাম-আয়েশে থেকে, পৃথিবীর সিংহভাগ ভূখণ্ডকে চরম বিপদের মুখে ফেলেছে জলবায়ু পরিবর্তন নামের দানবের জন্ম দিয়ে।

তারা জেগে থেকেও ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। তারা জানত, এই পৃথিবীটা আমাদের নয়; আমরা শুধুমাত্র একে ধার নিয়েছি আগামী প্রজন্মের কাছ থেকে:

'We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children.' Cree Indian prophecy.

বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতি প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

তাসমিন বাশার যারিন*

সাগর-মহাসাগরের তলায় রয়েছে এক আশ্চর্য জগৎ। এই আশ্চর্য জগতের বিশাল জলরাশি ও বিস্তর সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে যা 'ব্লু ইকোনমি' নামে পরিচিত। বিশ্ব ব্যাংকের মতে ব্লু ইকোনমি হলো সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নত জীবিকা সংস্থান ও কাজের লক্ষ্যে সামুদ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন। ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম অধ্যাপক গুন্টার পাওলি ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে ধারণা দেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বু ইকোনমি ক্রমান্বয়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক বিশাল পরিমাণ অংশকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা যাবে ব্লু-ইকনমির মাধ্যমে। ইতোমধ্যে সামুদ্রিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির বিকাশের জন্য ২৬ টি কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে সরকার।

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন ব্লু ইকোনমির প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। বছর ব্যাপী গোটা পৃথিবীতে সমুদ্রকে ঘিরে তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘঠিত হচ্ছে। গোটা বিশ্বের মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান আসে সামুদ্রিক মাছ উদ্ভিদ ও জীবজন্তু থেকে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট তেল ও গ্যাসের চাহিদার ৩০ ভাগ আসে সমুদ্র তলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর তথ্যমতে, মহাসাগর ইতিমধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে প্রায় ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মৎস্য খাত রয়েছে, ৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থানকে সমর্থন করে এবং দেশের প্রাণী-ভিত্তিক প্রোটিনের চাহিদার ৫০ শতাংশেরও বেশি সরবরাহ করে। সম্প্রতিকালে দেশটি নতুন নতুন এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা বাস্তবায়িত হলে সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের মূল্যমান জাতীয় বাজেটের দশ গুণ হবে।অস্ট্রেলিয়া সামুদ্রিক শিল্পগুলি হতে ২০১৩-১৪ সালে প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার আয় করে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এই আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলারে।

১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে ভারত মিয়ানমারের সাথে বিরোধ। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দা ল অফ সি (ITLOS) এর রায়ে ২০১১ সালে মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। এবং আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ে ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয় । বাংলাদেশ নতুন প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা পায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রসীমা জয়ের পর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিকাশের এক অপার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সমুদ্র হতে আহরিত মাছগুলোর মধ্যে ইলিশ সবচেয়ে বিখ্যাত। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে ইলিশের বিপুল চাহিদা ফলে ইলিশ রপ্তানি করে অর্জিত হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। এক হিসেবে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে আহরিত মাছগুলোর মধ্যে ১৬ শতাংশই ইলিশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে ৩,৭৬৮ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। সবচেয়ে সমৃদ্ধ সমুদ্রসীমা হিসেবে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে বলা হয় সোনালী ক্ষেত্র। ২০১৫-১৬ সালে বাংলাদেশে স্বাদু পানি হতে আহরিত মাছের পরিমাণ ছিলো ৩২ লাখ ৫১ হাজার টন অপরদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ২৬ হাজার টন। এ থেকে স্পষ্ট হয় সামুদ্রিক মাছ আহরণের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধারণা করা হয় বাংলাদেশের সাগর সীমার মধ্যে রয়েছে তেল ও গ্যাসের খনি। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের কোন সাশ্রয়ী পদ্ধতি এখনো বাংলাদেশ বের করতে পারেনি। যথেষ্ট সামুদ্রিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কিছুটা মন্থর।

বিশ্বব্যাংকের হিসেব মতে দেখা গিয়েছে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র বা নীল অর্থনীতির অবদান ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রায় সমান। আয়ের মূল অংশ আসে পর্যটন ও বিনোদন খাত হতে যার পরিমাণ ২৫ শতাংশ। মাছ ধরা খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ২২ শতাংশ, যাতায়াত থেকে আয়ের পরিমাণ ২২ শতাংশ এবং গ্যাস ও তেল উত্তোলন থেকে আয়ের পরিমাণ ১৯ শতাংশ। প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশি মাছ শিকারের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬০ লাখ বাংলাদেশি সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি ও জাহাজ নির্মাণ

*অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পে জড়িত। এ দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে সমুদ্রকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ২৬টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো হল: শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্র বন্দর, ফেরীর মাধ্যমে যাত্রী সেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, মৎস্য, সামুদ্রিক জলজ পণ্য, সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি, তেল ও গ্যাস, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, ব্লু-এনার্জি, খনিজ সম্পদ (বালি, নুড়ি এবং অন্যান্য), সামুদ্রিক জেনেটিক সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, বিনোদনমূলক জলজ ক্রীড়া, ইয়টিং এবং মেরিনস্, ক্রুজ পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা, কৃত্রিম দ্বীপ, সবুজ উপকূলীয় বেল্ট বা ডেল্টা পরিকল্পনা, মানব সম্পদ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং নজরদারি এবং সামুদ্রিক সমষ্টি স্থানিক পরিকল্পনা (এমএসপি)। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ব্লু ইকোনমির সুবিধাগুলো বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার চেষ্টায় আছে ফলে সাম্প্রতিককালেই বাংলাদেশ সরকার ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ সেন্টার ও একটি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার প্রযুক্তিনির্ভরতা ও দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে এবং সেগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব সংগ্রহ এবং টেকসই বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

ধারণা করা যায়, সমুদ্রসম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হলে দেশের অর্থনীতিতে মোট আয়ের অর্ধেকের বেশি জোগান আসবে সমুদ্রসম্পদ থেকেই। তথ্য উপাত্ত ও সঠিক পরিসংখ্যান প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরকে এই খাতে আরো বেশি বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনোদন এবং মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাত থেকে আয়ের পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আরো বেশি সচল হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগই নয়, সাথে বেসরকারি, সামাজিক ও ব্যাক্তিগত উদ্যোগের সম্মিলিত প্রয়াস ঘটাতে পারলেই ব্লু ইকোনমি বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারবে।

ভবিষ্যৎ জ্বালানি সংকটের যুগোপযোগী সমাধান

শাহরীন তাবাসসুম*

পদার্থের ভৌত বা রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ব্যবহারযোগ্য যে শক্তি নিঃসৃত হয় তাই জ্বালানি। এমন এক প্রকার জ্বালানি হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে পরিচিত। মৃত গাছ বা মৃত দেহ হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে এই জ্বালানি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৬৫০মিলিয়ন বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এই সকল জ্বালানিতে উচ্চ পরিমাণে কার্বন থাকে। জীবাশ্ম জ্বালানিতে রাসায়নিক শক্তি জমা থাকে এবং পুড়ালে তাপশক্তি পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে গতি শক্তিতেও রূপান্তর করা যায়। কিন্তু এগুলো পোড়ানোর ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রতি বছর জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে ২১.৩বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হচ্ছে। বায়ুতে ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশে গিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মত ঘটনা ঘটছে। বাতাসের জলীয়বাষ্পের সাথে মিশে কার্বনিক এসিডরূপে ভূমিতে আপতিত হচ্ছে এবং মাটি ও ফসলের ক্ষতি সাধন করছে। অনেক ক্ষেত্রেই জীবের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তড়িৎ আহরণে কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা পারমাণবিক রিয়েক্টরে কর্মীর মৃত্যুর হারের সমান। সুতরাং বলাবাহুল্য যে জীবাশ্ম জ্বালানি টেকসই জ্বালানি নয়।

পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে আর্থসামাজিক ভাবে লাভবান হয়ে ও বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ভাবে লাভবান হওয়া যায় যে প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যমে তাকে জৈবপ্রযুক্তি বলা হয়। জৈবপ্রযুক্তির প্রতিটি উপাদান আহরণ করা হয় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে ও মানুষের জীবনকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য। পেট্রোল-ডিজেলের মাধ্যমে যে তাপশক্তি বা গতিশক্তি আমরা পাচ্ছি ঠিক একই পরিমান শক্তি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবেশগতভাবে পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধন না করে লাভ করা যায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

জৈব জ্বালানি বা বায়োফুয়েল হচ্ছে এক ধরনের পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। জৈব জ্বালানিতে ইথানল ও ডিজেলের সমন্বয় ঘটানো হয় এবং এর মূল উপাদান হচ্ছে চাল, ডাল, গম, ভুট্টা ও তেলবীজ জাতীয় খাদ্যশস্য। বর্তমানে এটি শুধু উন্নত বিশ্বেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ এ জ্বালানি প্রস্তুত অনেক ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই জ্বালানিকে উন্নত বিশ্বের জ্বালানি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২৫ গ্যালন জৈব জ্বালানি উৎপাদনে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে তা আফ্রিকার একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের এক বছরের আহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে প্রায় ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাত করে যে জৈব জ্বালানি উৎপাদন করছে এবং এতে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয় তাতে বাংলাদেশের মতো ৪টি দেশের মানুষের ৩ বছরের খাদ্য বিনষ্ট হচ্ছে।২০১৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র জৈব জ্বালানি উৎপাদন ১২ গুণ বাড়িয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করেছে। ব্রিটেন জৈব জ্বালানি প্রস্তুতের জন্য ১১৩ বিলিয়ন টন ভুট্টার ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এর জন্য উজাড় করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বনভূমি ও জলাশয়। যা খনিজ তেল ব্যবহারের দূষণের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকারক। বিষয়টি নিয়ে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'দি সায়েন্স' পত্রিকায় প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে ৫১ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ৫০ মিলিয়ন টন ভুট্টা যুক্তরাষ্ট্রে ইথানল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ৪০ লাখ বর্গ কিলোমিটার জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে শুধুমাত্র জৈব জ্বালানি বা বায়োফুয়েল তৈরিতে ব্যবহার করার জন্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জৈব জ্বালানি প্রস্তুত মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এ জ্বালানির উপাদান খাদ্যশস্য এবং তা আমাদের প্রধান খাদ্য। জ্বালানির জন্য এ খাদ্য ব্যবহৃত হলে দেশে দেখা দেবে চরম

*শিক্ষার্থী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্যসঙ্কট, দাম বেড়ে যাবে খাদ্যসামগ্রীর এবং ভোজ্য তেলের। যেখানে আমাদের দেশ প্রতিবছর হাজার হাজার টণ খাদ্য ঘাটতিতে পড়ে, আমদানি করতে হয় প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী, সেখানে খাদ্যশস্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন অনেকটা আষাঢ়ে গল্পের মতোই।

গবেষণায় প্রাপ্ত বর্তমানে জ্বালানির চাহিদা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বিদ্যমান গতিতে চলমান থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে তেল, ২০৬০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ২০৮৮ সালের মধ্যে কয়লার মজুদ শেষ হয়ে আসবে। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই সকলকে বিকল্প উৎস খুঁজতে হচ্ছে। বাংলাদেশও বসে নেই। চলছে নানা রকম প্রস্তুতি। টেকসই শক্তি উৎপাদন ও জ্বালানি চাহিদা পূরণ করার জন্য দেশে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে।

জৈবপ্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ হাতে কলমে দেখানো হয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায় বায়োগ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে কিংবা সোলার প্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে। যার ফলেশ্রুতিতে ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ১৯৮০ সালে সিলেটে সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি তৈরি করে যা নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট শক্তির ১০% করার আহ্বান জানায়। ২০১২ সালে "টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থায় যোগদান করে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে নিত্যদিনের বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস, বায়োফুয়েল, বায়ো ফার্টিলাইজারসহ নানা টেকসই শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। যা পরিবেশ ও মানুষের জন্য প্রায় শতভাগ নিরাপদ এবং জ্বালানি হিসেবে খুবই কার্যকরী। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রচলিত ও জীবাশ্ম জ্বালানির টেকসই বিকল্প উৎস।

পৌর বর্জ্যকে শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে ১,৮৬,৪০৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বিভিন্ন পচনশীল জৈব পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে গাঁজন প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস নামক জৈবজ্বালানী তৈরি করা হয়। এর প্রধান উপজাত হল মিথেন গ্যাস। ৬০-৭০% মিথেন পাওয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ উন্নতমানের জৈবসার হিসেবে জমিতে প্রয়োগযোগ্য। শুধু মিথেন গ্যাস নয়, জৈবশক্তি ব্যবহার করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ইথানল ও বায়োডিজেল উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়। এরপর সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত দেশে মোট ৭৬,৭৭১ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বায়োগ্যাস প্রযুক্তিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা অতি তীব্র। বর্তমানে দেশে মোট গবাদি পশুর সংখ্যা ২,৪১,৯০,০০০ টি যা থেকে প্রায় ২৪,২০,০০,০০০ কেজি বর্জ্য পাওয়া সম্ভব। এ পরিমাণ বর্জ্য থেকে দৈনিক ৩,১৯,০০,০০,০০০ ঘনমিটার জৈবগ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে। ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লান্ট থেকে ৭-৮ সদস্যের একটি পরিবারে রান্নার গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। এর জন্য প্রয়োজন ৬০-৭০ কেজি গোবর যা ৫-৬ টি গরু থেকেই পাওয়া যায়। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াও জৈবগ্যাস উৎপাদনের পর ব্যবহৃত পশুবর্জ্যকে জৈবসার হিসেবে কৃষিতে ব্যবহার করা যায়। এমনকি মাছের খাবার হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব যা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২০ সালের পর গৃহস্থালিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের কোন সংযোগ দেয়া হবে না। ব্যবহার করতে হবে এলপিজি যার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। এর টেকসই বিকল্প সমাধান হিসেবে বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করতে হবে।

বিভিন্ন রাসায়নিক সার কৃষিজ জমিতে প্রয়োগের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়, উদ্ভিদের ক্ষতি হয় পাশাপাশি জীববৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং পানি দূষিত হয়। রাসায়নিক সারের বিকল্প হতে পারে পরিবেশসম্মত ও পরিবেশবান্ধব জৈবসার। পরিবেশবান্ধব কৃষিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার, জৈব বালাইনাশক ও জৈব ব্যবস্থাপনা থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত চার ধরনের কম্পোস্ট সার বাজারজাত করা হয়- সাধারণ কম্পোস্ট সার, ভার্মি কম্পোস্ট সার, কুইক কম্পোস্ট সার এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট সার। সাধারণ কম্পোস্ট সার তৈরি করতে ২-৩ মাস সময় লাগে এবং কুইক কম্পোস্ট সার ১৪-১৫ দিনেই তৈরি করা সম্ভব। এ জাতীয় সারগুলো সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এবং এগুলো ব্যবহারে জমিতে ফলনও বেশি হয়।

টেকসই শক্তি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তির অসামান্য অবদান হচ্ছে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন যা বায়োগ্যাস, বায়োফুয়েল ও বায়োফার্টিলাইজার বা জৈবসার রূপে প্রতীয়মান। একটি জৈবগ্যাসের প্লান্ট থেকে একাধারে গ্যাস, জ্বালানি, সার ও মাছের খাবার পাওয়া যায় এবং বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্জ্য সমস্যার অবসান ঘটে। গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহার করার ফলে জ্বালানির জন্য গাছপালার উপর চাপ অনেক কম পড়ে। বায়োগ্যাস প্লান্টে খরচ কম হওয়ায় এবং পশুপ্রাণীর বর্জ্য বেশি ব্যবহার করায় বাড়িতে গবাদিপশুর খামার গড়তে অনেকে উৎসাহিত বোধ করে।

অপার সম্ভাবনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে অপার সম্ভাবনা, বিস্ময় ও দৃঢ় মনোবল। কিন্তু আমাদের সুযোগের অভাব আর নিজেদের হেয়ালিপনায় নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার ফলপ্রসূ সম্পদ। যার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের সামনে আরো একটি সুযোগ এসেছে তা হল জৈব প্রযুক্তি। এর সাহায্যে পাওয়া যায় উৎপাদনের টেকসই সমাধান। টেকসই শক্তি উৎপাদনে নতুন এই প্রযুক্তি বহির্বিশ্বে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদেরকেও এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করেই টেকসই শক্তি উৎপাদন লাভজনক। তবেই আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন হবে তেমনি প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই নগরায়নে পরিবেশবান্ধব আবাসন

নাঈম শাহরিয়ার*

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মন্দা ও স্বার্থপর যুদ্ধের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশগত দুর্যোগ, যা মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। পরিবেশের অবনমন ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের অন্যতম পুরোধায় হচ্ছে কৃষিকাজ ও বসতি স্থাপনের জন্য বনভূমি উজাড় করা, শিল্প সম্প্রসারণ স্থাপন, যানবাহন হতে বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গমন, বিষাক্ত বর্জ্য এবং ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs) নির্গমন ইত্যাদি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি করছে। ভৌগলিক কারণে দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ অন্যতম। 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২১' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, ভূমিধ্বস এসব নিয়ত দুর্যোগের পাশাপাশি বিগত বছরসমূহে তীব্র দাবদাহ দুর্যোগ ও জনভোগান্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শহরবাসী জনসংখ্যার অনুপাতও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জনশুমারী অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০% এর বেশি শহরাঞ্চলে বাস করে। দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকা জনসংখ্যার চাপে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ ও রাজধানী ঢাকাকে সবচেয়ে দূষিত শহর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্বল্প দাম, সহজে ব্যবহারযোগ্যতার ফলে প্লাস্টিক শিল্পের উল্লম্ফন ঘটেছে, যার অপরিনামদর্শী ব্যবহারে প্লাস্টিক দূষণ জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের শ্বাসরোধ করছে। শহুরে জনসংখ্যার স্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন জীবনমান ও পরিবেশের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে।

পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Calamity) এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকট (Climate Crisis) দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা অন্যতম টেকসই খাত আবাসনের (Housing Sector) উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে, যা আগামী কয়েক দশকে প্রাক্কলিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সুষ্ঠু আবাসন একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি আবাসিক ভবনে বাসিন্দাদের বসবাস ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। একটি জনবহুল আবাসনের ফলে একদিকে যেমন কার্বন নির্গমন হয়, তেমনি অন্যান্য জ্বালানি ও শক্তি ব্যবহার বৈশ্বিক উষ্ণায়নে প্রভাব রাখে। এছাড়াও আবাসিক ভবনের নির্মাণ, সংস্কার বা ধ্বংসের সময় শব্দ দূষণের পাশাপাশি পরিবেশও দূষণ হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ঋতু বৈচিত্র্য বিলীন হয়ে যাওয়ায় শীতকাল শেষ হতেই গ্রীষ্মকালের সদম্ভ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে ঋতুগত পরিবর্তনের ফলে তীব্র দাবদাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে, যেখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য সরাসরি তাপ বিকিরণ করে। দেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা মেগাসিটিতে এই তাপদাহ বায়ুদূষণসহ অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের সাথে মিলে নাগরিকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ফেলছে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণকারী এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার বাড়ছে। দস্যুদের কবলে পড়া দূষিত খালে পানির স্বল্পতা ও লোভী আবাসন নির্মাণকারীদের কনক্রিটের নিচে চাপা পড়া মাটির অনুপস্থিতি দৃশ্যমান। এই দুটো তাপশোষণকারী (Heat Absorbing) প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি গাছের অনুপস্থিতি শহরগুলোকে কাচের বাক্সে (Glass Box) রূপান্তর করছে। ইট, পাথর, বালি আর কনক্রিটের জংগল ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রখর সূর্যতাপ গ্রহণ করে রাতেও তা ধরে রাখছে, যতটুকু দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপ নিঃসরণ করছে, তা দূষিত বায়ুর আস্তরণ ভেদ করে উপরের স্তরে চলে যেতে পারছে না। যতদিন যাচ্ছে নগরায়নের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই নগরায়নের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব আবাসনের কোন বিকল্প নেই।

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রয়োজনে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নানারকম

*প্রিন্সিপাল অফিসার, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতে ও চলমান দুর্যোগ মোকাবিলা করতে বিদ্যমান স্থাপনায় নকশাগত ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নমুখী সরকার বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা যেমন অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১, বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান-২১০০, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০) ইত্যাদিতে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তা মোকাবেলায় করণীয় পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিশেষত Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) পরিবেশগত উন্নয়ন ও জলবায়ুগত প্রভাব প্রশমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা। তা স্বত্ত্বেও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি "সবার জন্য আবাসন" বাস্তবায়নের আঙ্গিকে আবাসন খাতের পরিবেশগত সংশ্লিষ্টতা ও নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন সংক্রান্ত স্বতন্ত্র নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রধান নগরাঞ্চল ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসমূহে পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়ন এখন সময়ের দাবি।

চিত্র-১ আবাসনের সাথে পরিবেশের সম্পৃক্ততার বিভিন্ন পর্যায়

মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম রূপরেখা হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ, যা পরিপালনে যে কোনো রাষ্ট্রসত্ত্বা নিজস্ব জাতিগত উন্নয়নের সাথে সাথে পারস্পারিক আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গ্লোবাল ভিলেজ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে ১১ নং অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই নগর ও জনপদ' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু বিশ্বব্যপী নগরায়নের হার বিগত দশকে অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতিসংঘের মতে ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০% এর বেশি মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করবে, এটা বলাই যায় যে, সুষ্ঠু নগরায়নের উপর দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল উন্নতি নির্ভর করছে। এটা সহজেই বোধগম্য যে, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের অন্যান্য ১৬টি অভীষ্টই ১১ নং অভীষ্টের সাথে সম্পৃক্ত। টেকসই নগরায়ন ও নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম উদ্যোগ পরিবেশবান্ধব উপায়ে মৌলিক প্রয়োজনীয়তা আবাসন নিশ্চিত করা।

সাধারণত গতানুগতিক ভবনগুলোতে অদক্ষভাবে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হয়, নির্মাণকালে ও দৈনন্দিন ব্যবহারে বিপুল পরিমাণে বর্জ্য উৎপাদন করে এবং ব্যাপক পরিমাণে দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে। এজন্য গতানুগতিক ভবনের পরিবর্তে ভূমি, প্রাকৃতিক

উপাদান ও শক্তির সঠিক ব্যবহার, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাশ্রয়, অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের বায়ুমানের উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য ও পুনর্ব্যবহার্য উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব আবাসন (Environment-friendly Housing) গঠন অপরিহার্য।

পরিবেশবান্ধব আবাসনের মোটা দাগে দুইটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

(১) শক্তি, পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং

(২) ভূমি নির্বাচন, কাঠামো নকশা, নির্মাণ প্রক্রিয়া, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও বিনষ্টকরণ- একটি ভবনের পূর্ণ জীবনচক্রের (Life cycle) সময়কালে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর আবাসনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা।

পরিবেশবান্ধব আবাসন তথা সবুজ ভবন নিশ্চিতকরণে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে U.S Green Building Council (USGBC) গঠিত হয়, যারা Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) নামক সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত Green Building Rating System প্রণয়ন করে১। এই LEED সনদ প্রতিটি দেশে Green Building Certification হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

USGBC সাধারণত ৫টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে LEED সনদ প্রদান করে থাকেঃ

১) টেকসই নির্মাণ-স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ পরিকল্পনা (Sustainable Site Design);
২) পানির গুণগত মান ও সংরক্ষণ (Water Quality and Conservation);
৩) শক্তির ব্যবহার ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব (Energy and Environment);
৪) অভ্যন্তরীণ পরিবেশের গুণগত মান (Indoor Environmental Quality) এবং
৫) নির্মাণ উপকরণ ও সম্পদের ব্যবহার (Materials and Resources) ।

জনবহুল বাংলাদেশে আবাসন চাহিদার প্রেক্ষিতে আবাসন নির্মাণে ভূমি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের ভূমি অব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। তা সত্ত্বেও, দেশের আবাসন চাহিদা পূরণে ও আবাসিক জমির অপ্রতুলতার কারণে জলাশয় ভরাট করে ভবন নির্মাণ করা হয়। অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা সঠিকভাবে সয়েল টেস্ট না করানো, ব্যয় সাশ্রয়ে পাইলিং এ অনীহা ইত্যাদি কারণে ভবনধ্বসের মত ঘটনা ঘটে। ভূমির সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড পরিপালনে গৃহায়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবনের চারপাশে পর্যাপ্ত জায়গা ফাঁকা রেখে ভবন নির্মাণ অপরিহার্য। অনুমোদিত প্ল্যান পরিপালনে ভবনে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নিশ্চিত করা সম্ভব, যা দিনের বেলায় বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার হ্রাস করবে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে দক্ষিণ-পূর্বমুখী ভবনে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ফলে তাপদাহের প্রভাব প্রশমন করা যাবে। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশে এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ফলে ব্যয়বহুল এয়ার কন্ডিশনার মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতের নাগালের মধ্যে এসে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব কিছু রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার বাদে বাকিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাবক গ্রীনহাউজ গ্যাস হিসেবে পরিচিত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস নির্গত করে। অপরিকল্পিত নগরায়নের আরেক ফলাফল ক্ষতিকর মশা বৃদ্ধি পাওয়ায় সিএফসি গ্যাসের আরেক উৎস এরোসলের (Aerosol) ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে উৎপন্ন মৌলিক শক্তির প্রায় ৩০-৪০% আবাসিক ভবনে ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার একটি প্রকাশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ভবন হতে বৈশ্বিক হিসেবে ২৪% এরও বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হয়৩।

বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভব হলেও বিদ্যুতের সরবরাহ অসীম নয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জ্বালানির মুখ্য উৎস হল জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) যার মধ্যে রয়েছে তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। জীবাশ্ম জ্বালানির তিনটি রূপই পরিবেশের প্রধান শত্রু কার্বন নিঃসরণের খলনায়ক এবং শক্তি উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা বিশ্বকে অনির্দিষ্টকালের জীবনক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে রেখেছে। বিশেষ করে আবাসনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। সোলার প্যানেল ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী গৃহস্থালী উপকরণ আপাতদৃষ্টিতে ব্যয়বহুল মনে হলেও ভোক্তাদের আগ্রহ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে মূল্যসাশ্রয়ী পর্যায়ে আসবে। প্রাকৃতিক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি। ব্যবহৃত পানি সাধারণত মিউনিসিপাল সুয়ারেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাল-বিল বা নদীতে গিয়ে পড়ে। একইভাবে বৃষ্টির সময়ে হাজার হাজার লিটার পানি ব্যবহারের অযোগ্য রয়ে যায়। পানি ব্যবহার সাশ্রয়ের জন্য মানসম্পন্ন পানি সাশ্রয়ী ফিটিংস যেমন Auto Control Valve, Plumbing Fittings, Aerator, Flow Control

And Pressure Reducing Device ইত্যাদি ব্যবহার করার পাশাপাশি ভবনসমুহে পানির পুনর্ব্যবহারের (Reczcle and Reuse) জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশে অধিকাংশ ভবন নির্মাণে পোড়ামাটির ইট ব্যবহৃত হয়। সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ইটভাটা ২০২৫ সাল নাগাদ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। উন্নত দেশের ন্যায় পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন বিকল্প নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিতকরণের অন্যতম শর্ত। Compressed Stabilized Earth Block (CSEB), Cellular Light Weight Concrete Block (CLCB), Sand Cement Hollow Block (SCHB) ও Thermal Block পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আবাসিক ভবনের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের পাশাপাশি এসব পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার তুলনামূলক সহজ, শক্তিসাশ্রয়ী ও মূল্যসাশ্রয়ী।

আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব আবাসনের অন্যতম উপাদান। এদেশের অনেক জনগণ সচেতনতার অভাবে ভবনের চারপাশে ও সংলগ্ন রাস্তায় বর্জ্য নিক্ষেপ করে, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশের চরম শত্রু প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস পরিবেশবান্ধব আবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দাম কম ও সহজলভ্য হওয়ায় পলিথিন, প্যাকেট, প্লাস্টিকের আসবাবপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার আশংকাজনক হারে বাড়ছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। উল্লেখ্য, দূষণের আরেক রূপ শব্দ দূষণের হাত থেকে বাচতে ব্যস্ত সড়কের পাশে বাড়ি নির্মাণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিবেশবান্ধব আবাসনের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভবনের চারপাশে ফাকা জায়গায় বৃক্ষরোপন ও ভবনের ছাদে, বারান্দায় বাগান স্থাপন। বর্তমানে ইনডোর প্ল্যান্ট সহজলভ্য, যা ঘরের বাতাসের দূষিত পদার্থ শোষণ করে। আধুনিক বিশ্বে নগর-কৃষি (Urban Agriculture) ও উল্লম্ব বাগান (Vertical Garden) জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দেশের বনভূমির পরিমাণ যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে তাতে নগরায়ন ও বনায়নকে একসূত্রে গাঁথা না গেলে ভবিষ্যতে বড় বিপদের আশংকা থেকে যাবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে পরিবেশবান্ধব আবাসনকে উৎসাহিত করতে নগরভিত্তিক গ্রীন থাম্ব (Urban Green Thumb) ধারণাকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুরস্কৃত করতে পারে।

গ্রীন থাম্ব বলতে শস্য উৎপাদন বা বৃক্ষ পালনের সহজাত দক্ষতাকে বোঝায়। পরিবেশ অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নিতে পারে।

বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব আবাসনের দুঃখজনক দিক হলো, দেশে যেসব ভবনকে LEED সনদ প্রদান করা হয়েছে তার অধিকাংশই শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট নাহয় বাণিজ্যিক ভবনের জন্য। বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন পূর্নাঙ্গ আবাসিক ভবন হিসেবে যথাযথ পরিবেশবান্ধব ভবনের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবেশবান্ধব আবাসনের শর্তাবলী পালন করে বাড়ি নির্মাণ করলে তা বাড়ির মালিকের দৃষ্টিতে লাভজনক নয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণের মাঝে সঠিক তথ্য ও সচেতনার অভাব প্রকট। কারণ, উন্নয়নশীল অর্থনীতির বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব আবাসনের ধারণাটি নতুন ও আধুনিক। দেশের প্রথম সারির কিছু রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কোম্পানি পরিবেশবান্ধব আবাসন বা গ্রীন বিল্ডিং নির্মাণের প্রচারণা ও বাস্তবায়নের কথা বললেও দৃষ্টিনন্দন এই তথাকথিত গ্রীন বিল্ডিংসমূহ একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত আয়শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, তেমনি সঠিকভাবে শক্তিসাশ্রয়ী না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ পরিবেশবান্ধব নয়। বাস্তব চিন্তা করলে দেশের প্রেক্ষাপটে অধিক লাভের আশায় আবাসিক বাড়ি নির্মাণকারীদের অসাধু মনোভাব পরিবর্তন ও ভবনের সাইড স্পেস ফাঁকা রেখে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ নিশ্চিতকরণ কষ্টসাধ্য। নির্মিত বাড়িতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, সবুজায়ন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ও উপকরণ ব্যবহার, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত ফিটিংস ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার (Reczcle) ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি বর্তমানে ব্যয়বহুল। এসব কারণে আধুনিক বিশ্বের মডেল অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব আবাসনের উদ্যোগটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুসংগত (Adaptive) নয়।

পরিবেশবান্ধব টেকসই "আবাসিক" বাড়ির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও মূল্যায়নের জন্য বিশ্বব্যাপী যে মাপকাঠি (Benchmarks)/ রেটিং সিস্টেম রয়েছে, তা এ দেশের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন খাতে নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় স্বনির্ধারণ (Customization) করা হলে তা পরিবেশবান্ধব আবাসন চিহ্নিতকরণে আরো যথার্থ ও কার্যকর মানদন্ড হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

সরকারের উদ্যোগ এবং গৃহায়ন খাত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই নগরায়নের সাথে সাথে দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নির্মাণ শিল্পের বিকাশ, সামাজিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামষ্টিক এবং ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। মানবসভ্যতা পরিবেশের উপর সদানির্ভরশীল; তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু মোকাবেলায় সকলকে সচেতন হতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১) U.S Green Building Council এর ওয়েবসাইট (https://www.usgbc.org/).

২) U.N Environment Programme, Building and Climate Change; Status, Challenges and Opportunities (2007).

৩) International Energy Agency, Promoting Energy Efficiency Investments: Case Studies in The Residential Sector (2008).

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য: আইনের পরিকল্পিত বাস্তবায়ন চাই

বিধানচন্দ্র পাল*

নতুন কোনো কিছু প্রচলিত হলে সেটার প্রতি আগ্রহ মানুষের অনেকটাই বেশি থাকে। আশির দশকের প্রথম দিকে পলিথিন ব্যাগ যখন প্রথম বাজারে আসলো তখন মানুষের মধ্যে অন্যরকমের এক আধুনিকতার ছোঁয়া, অনন্য এক শিহরণ জেগেছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালে বাণিজ্যিকভাবে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয় বাংলাদেশে। ধীরে ধীরে প্লাস্টিক ও পলিথিনের তৈরি করা নানা ধরনের সামগ্রী ধনী থেকে গরীব সবার জন্যই অপরিহার্য এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আগের দিনের ব্যাগ হাতে করে বাজারে যাবার দৃশ্য এখন আর তাই খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

দিন পাল্টেছে, মানুষের অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অনেক দেশও খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে যে, পলিথিন ব্যাগ হলো ক্ষতিকর এবং জীবন বিনাশকারী পদার্থ। বর্তমানে বিশ্বের ৮৭টি দেশে তাই একবার ব্যবহারোপযোগী পলিথিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। আর পলিথিনের ভয়ানক ক্ষতির দিক চিন্তা করেই ১ জানুয়ারি, ২০০২ থেকে ঢাকা শহরে এবং ১ মার্চ, ২০০২ সাল তারিখ থেকে সারাদেশে পলিথিনের উৎপাদন ও বাজারজাত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আশার সঞ্চার করেছিলো। সে সময়ে বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি সামগ্রীর দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছিলো, কাগজের তৈরি ঠোঙার ব্যবহারও বেড়ে গিয়েছিলো।

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ধীরে ধীরে পলিথিনের ব্যবহার আবারও বাড়তে থাকে। ফলে ২০১০ সালে সরকার আবারও বাজারে পলিথিন থামাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। সে সময় ১৭টি পণ্যের মোড়ক হিসেবে প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। যদিও এ জন্য অল্পকিছু অভিযান পরিচালনা করা হয়। যেমনঃ পলিথিন দমনে পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসেবে, বিগত পাঁচ বছরের একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, ভ্রাম্যমাণ আদালত ৪ হাজার ৭৮৭টি মামলা দিয়েছে। এসব মামলায় অনেক জনকে বড় অঙ্কের জরিমানাও করা হয়, অনেক পলিথিন জব্দও করা হয়। কিন্তু এত অভিযানের পরেও পলিথিন ব্যবহার কমছে না।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি সংরক্ষণ ও পরিবহনে বাধ্যতামূলকভাবে পাটের বস্তা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আদেশ জারি করে। এরপর ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে দুই দফায় আদেশ দিয়ে আরো ১১টিসহ মোট ১৭টি পণ্যের মোড়ক হিসেবে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এর বাস্তবায়ন প্রকৃত অর্থে কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ও প্রশ্ন রয়েছে।

এছাড়া গত ৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে উচ্চ আদালত এক বছরের মধ্যে দেশের উপকূলীয় এলাকায় পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগ এবং একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার, বহন, বিক্রি ও বাজারজাতকরণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এতোকিছুর পরও মূল আইনের কঠোর প্রয়োগ খুব একটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৭ সালের গ্রহণ করা এ সকল উদ্যোগ, আদেশ ও পদক্ষেপ এবং সর্বশেষ উচ্চ আদালতের রায় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিলো, কিন্তু এসবের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট ও আমাদের গভীরভাবে শিক্ষা নেয়া উচিত। সেটি হলো, যখন একটি উদ্যোগের, আদেশের ও পদক্ষেপের ইতিবাচক প্রভাব জনজীবন ও পরিবেশের ওপর পড়তে শুরু করে, তখন তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা সবচাইতে বেশি জরুরি।

এসব পদক্ষেপের জোরালো ধারাবাহিকতা না থাকায় হীতে বিপরীত হয়েছে। আগের তুলনায় আমরা আরও অনেক বেশি পরিমাণে বিষাক্ত পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়িয়েছি। জাতীয় একটি দৈনিকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এ তালিকায় ১ম হয়েছে চীন, ভারত ১২তম অবস্থানে, পাকিস্তান ১৫তম ও মিয়ানমার ১৭তম অবস্থানে রয়েছে।

আইনে নিষিদ্ধ থাকলেও বাজারে পলিথিনের ব্যবহার চলছে যথেচ্ছ পরিমাণে। বাংলাদেশে প্রতিদিন কী পরিমাণে পলিথিন উৎপাদন, ব্যবহার বা বর্জ্য হিসেবে জমা হয়- এ নিয়ে সরকারি কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা হিসাব নেই। ফলে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য জরিপ ও গবেষণা হওয়া এবং সে অনুসারে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা এ মুহূর্তে খুবই জরুরি।

*সংস্কৃতিকর্মী ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রভা অরোরা এবং সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, নগর গবেষণা কেন্দ্র

চারপাশে নানা রঙে, নানা চেহারার পলিথিন। পলিথিন ব্যাগ ছাড়াও আমাদের দেশে প্লাস্টিক দিয়ে দড়ি, গামলা, বালতি, বোতল, পাইপ, স্যালাইনের বোতল, চায়ের কাপ, খেলনা, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, কোমল পানীয়ের পাত্রসহ বিভিন্ন ধরনের ও রকমের পণ্য উৎপাদিত এবং বাইরের দেশ থেকে আনা হচ্ছে।

এছাড়া বিশেষ করে ওয়ান-টাইম ব্যবহারের প্লাস্টিক সামগ্রীর (যেমন: বোতল, কাপ, প্লেট, বক্স, চামচ, স্ট্র ইত্যাদি) ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় প্রতিদিন আমরা নানাভাবে প্লাস্টিকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি। আর যেহেতু এসব পণ্যের যথেষ্ট বাজার চাহিদা রয়েছে এবং অত্যন্ত লাভজনক তাই সারা দেশজুড়েই এসব পণ্যের আবারো প্রসার ঘটেছে। ফলে এটা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা আসলে যেন এক 'প্লাস্টিক সময়ে' বসবাস করতে শুরু করেছি।

অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ ও অলৌহ ধাতু দিয়ে তৈরি উৎপাদিত সামগ্রীর স্থানও এখন প্রায় পুরোপুরিভাবেই দখল করে ফেলেছে যেন এ সকল প্লাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় পণ্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নীতি-নির্ধারক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কেউই বোধ হয় পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য ব্যবহারের ঝুঁকি ও ভবিষ্যত ভয়াবহতা এতোটুকুও অনুধাবন করতে পারছি না।

একটি প্রশ্ন তাই সবার সামনে নিয়ে আসাটা এখন খুবই জরুরি হবে- আমরা আমাদের পূর্বের 'ভালো' অভ্যাসগুলোকে পরিবর্তন করে, অনেকক্ষেত্রে বর্জন করে আধুনিকতা ও উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত নিজেদের এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছি নাতো?

পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত ও স্বীকৃত একটি বিষয়। আসলে প্লাস্টিকের কাঁচামাল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বাইরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আর প্লাস্টিক ও পলিথিন তৈরি হয় বিদেশ থেকে আনা অনেকটা সাবুদানার মতো গ্রানিউল নামক পদার্থ দিয়ে। পলিথিন রাসায়নিক তন্তুজাত দ্রব্য। অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রোপাইলিনের সাথে প্রেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বনের তিন/চারটি মলিকুলের সংমিশ্রণে পলিথিন তৈরি হয়।

পলিথিন এমন এক অসম্পৃক্ত যৌগ যার অণুগুলো ব্যাগ/ব্যাগ জাতীয় উপাদান তৈরির পরও কিছু কিছু বাহু মুক্ত অবস্থায় থেকে যায়। পলিব্যাগে বহন করা এবং পলি ব্যাগে রাখা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মুক্ত অবস্থায় থাকা বাহুগুলোর সাথে মিলেমিশে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। প্রতিদিন এই বিষ অল্প অল্প করে শরীরে প্রবেশ করে। অনেকটা স্লো-পয়জন-এর মাধ্যমে মানবদেহ আক্রান্ত হয় অনেক ধরনের জটিল রোগ-ব্যাধিতে। পাকস্থলি ছাড়া যদি এই বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য রক্তে মিশ্রিত হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রকৃতির মরণব্যাধি ও ক্যান্সারে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে।

এছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, পলিথিনে মোড়ানো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে কোন ধরনের লক্ষণ ছাড়াই মানুষ আক্রান্ত হতে পারে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগে। এর মধ্য দিয়ে কিডনির বিভিন্ন জটিল রোগেও মানুষ বিপর্যস্ত হতে পারে।

গোটা দেশকে ভয়ানক এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে প্লাস্টিক ও পলিথিন। প্লাস্টিক ও পলিথিন পোড়ালে অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস হাইড্রোজেন সায়ানাইড উৎপন্ন করে। পোড়ানোর সময় প্লাস্টিকের উপকরণ পলিভিনাইল ক্লোরাইড পুড়েই আসলে সেই বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। ফলে বাতাস দূষিত হয়। যার ফলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাইড্রোজেন সায়ানাইড মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে ত্বকেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও এ জাতীয় পণ্য পোড়ানোর সময় আরও বিভিন্ন রকম ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পলিথিন তৈরি হয় এমন ধরনের উপাদান দিয়ে, যা প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য মোটেও সহায়ক নয়। পলিথিনের ভেতরে থেকে বিষফেনোল নামক এক ধরনের পদার্থ নির্গত হয়, যা খাদ্য দ্রব্যের সাথে সহজে মিশতে পারে। এটা বিষের সমতুল্য।

পলিথিন ও প্লাস্টিক দীর্ঘজীবী, এ জাতীয় দ্রব্য সহজে মাটির সাথে মিশতে পারে না। আর মাটিতে মিশতে পারে না বলে মাটির স্তর পৃথক হয়ে অক্সিজেন শোধন ক্ষমতা কমিয়ে মাটির জৈব পদার্থ ঘাটতি তৈরি করে উর্বরা শক্তি নষ্ট করে দেয়। ফসলের জমির জন্য যা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। শুধু তাই নয়, মাটিতে বিদ্যমান উপকারী ব্যাকটেরিয়া এরা মেরে ফেলে এবং সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মাটির যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বা ক্রিয়াকর্ম সেই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া বর্জ্যে প্লাস্টিক এবং অজৈব ও বিষাক্ত উপাদানের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্জ্যাগারসমূহ বিষাক্ত রাসায়নিক (টক্সিক) দূষণের উৎসে পরিণত হচ্ছে।

পলিথিন শহরের নালা-নর্দমা, পয়ঃনিষ্কাশন লাইনে পড়ে এক অস্বস্তিকর, জনস্বাস্থ্য হানিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্লাস্টিক শিল্পের আবর্জনায় এমন অনেক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা থেকে ব্রোংকিয়াল এ্যাজমা, ক্রনিক ব্রোংকাইটিস ও এমফাইসেমা জাতীয় রোগ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ সকল আবর্জনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়সহ পানিবাহিত ও পেটের নানা ধরনের রোগ বিস্তারলাভ করে। এছাড়া ক্রিমি বিস্তারেও এই আবর্জনা সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে বিশেষভাবে শিশুরা অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতার শিকারে পরিণত হয়।

ডাস্টবিনসহ নানা স্থানে ফেলে দেয়া পলিথিন বিভিন্নভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পলিথিন নদীর তলদেশে জমা হয়ে নদীর তলদেশও ভরাট করে ফেলে। খুব সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দৈনিকে নিশ্চয়ই বরিশাল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী কীর্তনখোলা বর্জ্য-প্লাস্টিকে ভরাট হয়ে যাওয়ার খরবটি সবার চোখ এড়িয়ে যায় নি।

শুধু ভরাট হওয়া নয়, নদীর তলদেশে বর্জ্য ও প্লাস্টিকের আস্তরণ এতোটাই পুরু হয়েছে যে, ভাটার তোড়েও সেসব অপসারিত হতে পারে না। এ কারণে কীর্তনখোলার গভীরতাও অনেক কমে গেছে। অনেক সময় ভারী নৌযান পর্যন্ত আটকে যায়। নদীর নাব্যতা ঠিক রাখতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) নিয়মিত খনন করে থাকে। কিন্তু পলিথিন ও প্লাস্টিকের আস্তরণের কারণে সেই খননকাজও চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

ফলে প্লাস্টিক যে কেবল ভূভাগেই বিড়ম্বনা এবং নানান ক্ষতির আশঙ্কা বাড়াচ্ছে, তাই নয়। নদী থেকে সাগর ও মহাসাগরেও প্রতিনিয়ত জমছে বহু প্লাস্টিক-বর্জ্য। এই জঞ্জাল নদী তলদেশের প্রাণিসম্পদ ও উদ্ভিদ তথা সার্বিকভাবে জীববৈচিত্র্যেরও অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে।

ফলে দেশের জনগণ চায় পলিথিন ও প্লাস্টিক থেকে মুক্ত হতে। এজন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ করার মাধ্যমে পলিথিন কারখানাসমূহ বন্ধ করাসহ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা খুব জরুরি। আর কেবল ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার রোধ করা যাবে না। আইনের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহকে যুক্ত করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে একটি মনিটরিং ব্যবস্থার কথাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা যেতে পারে।

একইসাথে প্রণীত আইনটির ব্যাপক প্রচার এবং জনসচেতনতা তৈরির ব্যাপারেও সরকারকে গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ সকল কাজে সরকারের পাশাপাশি প্রচার মাধ্যমও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। স্কুল কলেজসহ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে পলিথিন ও প্লাস্টিকের স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত ক্ষতির দিকটি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া প্রতিটি উপাসনালয়ে পরিবেশের উপর আলোচনা করার বিশেষ নির্দেশনাও প্রদান করা যেতে পারে।

প্লাস্টিকের পরিবর্তে যেসব প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহৃত হতে পারে, তার মধ্যে পাট অন্যতম। পাটকে, পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে বহুবিধভাবে ব্যবহার করার জন্য আরও গবেষণামূলক কার্যক্রম ও উদ্যোগ হাতে নেয়াটা সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ হবে। উৎকৃষ্ট মানের পাটের অন্যতম উৎপাদক হিসেবে বাংলাদেশ পাটের সৃষ্টিশীল ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার হ্রাস করতে পারে। বাংলাদেশ পাট শিল্পের পুনরুদ্ধারে জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারে। বিশ্বে কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে অগ্রণী এবং দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

ফলে পাটের ব্যাগ এবং অন্যান্য পাটজাত পণ্যের ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে দেশের পাটচাষী ও পাট শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়। রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং একইসাথে পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে।

পাশাপাশি সবচেয়ে আজ বড় যে প্রয়োজন তা হলো, একজন নাগরিকের অবস্থান থেকে প্রত্যেকে সচেতন হয়ে ওঠা এবং পলিথিনকে 'না' বলা। আর এসবের মাধ্যমেই পলিথিনের পুনরুত্থান রোধ করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে পরিবেশ বিপর্যয় কমিয়ে আনা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও সর্বোপরি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি

মোঃ জিয়াউর রহমান*

চিকিৎসা এবং হাসপাতাল– এ দুটি শব্দ একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাসপাতালে রোগীরা যান সুচিকিৎসার আশায়, রোগ মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে। রোগমুক্ত না হয়ে বরং সেই হাসপাতাল থেকেই যদি রোগের উৎপত্তি হয়, তাহলে বিষয়টি কেমন দাঁড়ায়? হাসপাতালগুলোর বাস্তব চিত্র এখন অনেকটাই এমন। বর্জ্য অব্যবস্থাপনাই হাসপাতাল থেকে রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একেবারেই নাজুক। যার ফলে করোনাভাইরাসসহ অন্যান্য মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসা বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী বাস্তবায়ন এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, হেপাটাইটিস বি ও সি, টাইফয়েড, নিউমনিয়া, এইডস, চর্মরোগ, হাঁপানী, সর্দি-কাশি, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহসহ অনেক রোগ ছড়াতে পারে স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের অনিরাপদ নিষ্কাশনের জন্য। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য বলতে বুঝায় মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীর রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, রোগ প্রতিরোধ করার কারণে, এমনকি রোগ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমের কারণে যা উৎপন্ন হয়। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যকে আরো অনেক নামে অভিহিত করা হয়। ইউরোপিয়ান সংজ্ঞায় এটাকে 'স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য, যুক্তরাষ্ট্রে এ বর্জ্যকে 'মেডিক্যাল বর্জ্য' এবং বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী এ বর্জ্যকে ' ক্লিনিক্যাল বর্জ্য' নামে অভিহিত করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবার ফলাফল হিসেবেই হাসপাতালে বর্জ্যের জন্ম হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি রোগ ছড়ানোর উৎস হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে। এ শতাব্দীতে পরিবেশ আন্দোলনের পাশাপাশি হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি নতুন অধ্যায়। উন্নয়নশীল বিশ্বে সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে অধিক সীমাবদ্ধতার ভিতরে দিন দিন স্বাস্থ্যখাতে অত্যাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি যোগ হচ্ছে, ফলে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন হাসপাতাল বর্জ্য। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার অত্যাবশকীয় উপাদান। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যকে অবশ্যই জনস্বাস্থ্যসহ পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিসর অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে প্রতিনিয়তই বাড়ছে ডিসপোজেবল চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবহার। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এই বর্জ্যের বেশিরভাগই কমবেশি সংক্রামক জীবাণুর বাহক। দেশের হাসপাতালগুলো এখনও বিশ্বমানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অর্জন করতে সক্ষম নয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য যাচ্ছেতাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অপসারণ করে থাকে।

মানুষ হাজার হাজার বছর আগে অর্থাৎ আদিম যুগ থেকে সবসময় কিছু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং কৌশল অনুশীলন করেছিল। তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী, ইঁদুর এবং অন্যান্য প্রাণীগুলি থেকে রক্ষা পেতে প্রাথমিকভাবে বর্জ্যগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বালির মধ্যে খনন করে রাখা হতো। এ পদ্ধতি অবলম্বন করেও মানুষের মধ্যে প্রচুর রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অথবা চিরাচরিত নিয়মে বর্জ্য অপসারণ করার কারণে পৃথিবী আজ দূষণে পরিণত হচ্ছে। বিশ্বের বেশিরভাগ পরিবেশবিজ্ঞানী ও সচেতন নাগরিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেই ঐতিহ্যগত পদ্ধতি আর সমর্থন করছেন না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা সংস্কৃতিগতভাবে সচেতন নই। প্রকৃতিগতভাবেই এই ব্যবস্থাপনা চলে আসছিল। কিন্তু নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে অবস্থান করার ফলে বর্জ্যের পরিমান দ্রুত বেড়ে গিয়ে নাগরিক জীবনে নানা রোগের সৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, দুর্গন্ধ, দৃষ্টিকটুতা, চলাফেরার সমস্যাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সাধারণ বর্জ্য নিয়ে মানুষ কিছুটা সচেতন। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য নিয়ে এখনও তেমন কোন সচেতনতা আসে নাই।

১৯৮০ সালে এ অঞ্চলে এইডস রোগের মহামারি দেখা যায়। ইপিডিমিওলজিক্যাল সার্ভিলেন্স এ প্রতীয়মান হয়, নেশাকারীদের মধ্যে অপরিশোধিত ব্যবহৃত সিরিঞ্জের গণব্যবহার, এইডস রোগের মহামারির অন্যতম কারণ। ফলে সৃষ্টি হয় ব্যবহৃত সিরিঞ্জের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যকর ব্যবস্থা, জন্ম হয় নতুন এক অধ্যায়ের, স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিন্তাধারা। এর পূর্বে স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য বিষয়ে

*সভাপতি, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ)

মানুষের তেমন কোনো ধারনা ছিল না। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু ক্ষতিকারক ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য তৈরী হয় সমস্ত বর্জ্যের শতকরা মাত্র ১০-২০ ভাগ। এই অল্প পরিমান ক্ষতিকারক ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের বৈশিষ্ট হলো এই বর্জ্যের মধ্যে সংক্রামক জীবাণু, জেনটক্সি পদার্থ, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ধারালো বর্জ্য থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এই শতকরা ১০-২০ ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বর্জ্যের সাথে মিশে সমস্ত বর্জ্যকেই ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যে পরিণত করে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের ঝুঁকিপূর্ণ অংশের সংস্পর্শে আসবে তারা সকলেই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বহন করে। তবে ঝুঁকির পরিমান নির্ভর করে বর্জ্যের ধরণ এবং বর্জ্যের সংস্পর্শে আসার প্রবণতা, মাত্রা এবং মেয়াদের ওপর। যে ব্যক্তি যত বেশী এই বর্জ্যের সংস্পর্শে আসবে, সেই ব্যক্তি তত বেশী ঝুঁকিপূর্ণ থাকবে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন নার্স, টেকনিশিয়ান,আয়া, ক্লিনার, ডাক্তার, রোগী, দর্শনার্থী, ক্লিনিক ম্যানাজার ও অন্যান্য কর্মী, টোকাই, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মী, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের এর আশে পাশে বসবাসকারী এবং সাধারণ মানুষ।

একটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী হাসপাতাল ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থা। অথচ বাংলাদেশে মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশনের কার্যকর ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশনের মানদন্ডে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য অব্যবস্থাপনার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে, বিশেষ করে ধারালো বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা না করা। ঝুঁকি কম হলেও, দূষিত বর্জ্য সম্ভাব্য ভাইরাস প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে, যার ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০০ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে দূষিত সিরিঞ্জের ব্যবহারের ফলে ২১ মিলিয়ন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমণ (সকল নতুন সংক্রমণের ৩২%), ২ মিলিয়ন হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমণ (সমস্ত নতুন সংক্রমণের ৪০%), কমপক্ষে ২৬০,০০০ এইচআইভি সংক্রমণ (সব নতুন সংক্রমণের ৫%) ঘটেছে।

বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল দা ল্যানসেট সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৫৪টি সরকারি হাসপাতাল ও ৫ হাজার ৫৫টি বেসরকারি হাসপাতাল আছে। মোট শয্যার সংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৯০৩টি। প্রতিটি শয্যা থেকে প্রতিদিন গড়ে ১.৬৩ থেকে ১.৯৯ কেজি স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর মেডিকেল বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায় ৫২ লাখ মানুষ মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের মধ্যে ৪০ লাখই শিশু। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল ও দশম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ফলে দেশে বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে বেড়ে চলেছে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার সমস্যাও। বর্তমানে বাংলদেশে বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২২.৪ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম। এ হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে, ২০২৫ সালে দৈনিক প্রায় ৪৭ হাজার ৬৪ টন বর্জ্য উৎপন্ন হবে। এতে করে মাথাপিছু হার বেড়ে দাঁড়াবে ২২০ কিলোগ্রাম। ফলে এখনই প্রয়াজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ নেওয়া।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনা সংক্রমণের আগে থেকেই বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে রীতিমত হিমসিম খাচ্ছিল। করোনার কারণে হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমাণ হঠাৎ আরও বাড়তে শুরু করে। টিকাদান কাজে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ-সূচ,স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস, পিপিই এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিদিন। আবার এর মধ্যে রোগীর বিছানা, চাদর, মাস্ক সবকিছু পড়ে। করোনাকালে সাধারণ মানুষের ব্যবহার করা মাস্ক-গ্লাভস, পিপিই মেডিকেল বর্জ্য বলা যেতে পারে। সবমিলিয়ে ব্যাপকহারে চিকিৎসা বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। বর্জ্যের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা পরিবেশের জন্য হুমকি, যা দীর্ঘমেয়াদী এবং অনাকাঙ্খিত জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াবে।

মেডিকেল বর্জ্যগুলো অটোক্লেভ মেশিনের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়িয়ে ফেলার বিধান থাকলেও হাতে গোনা কয়েকটি হাসপাতাল তা মেনে চলছে। তাছাড়া, বেশিরভাগ মানুষই এইসব মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার জীবাণুমুক্ত না করে যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছে। এসব বর্জ্য ও ওষুধে যেসব কেমিক্যাল থাকে, সেগুলো ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে পানিতে প্রবাহিত হয়। মেডিকেল বর্জ্যগুলো একদিকে যেমন সংক্রমণের ব্যাধি ছড়ানোর মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আবার পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়াচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে

এই বর্জ্যগুলো বৃষ্টির পানির সাথে মিশে বিভিন্ন খাল, ডোবা, নদ-নদীর পানিতে যায়। ফলে পানি দূষিত হয়। আবার মেডিকেল বর্জ্যগুলোর জীবাণু বাতাসে মিশে বায়ু দূষিত করে। অর্থ্যাৎ ক্রমাগতভাবে এটি জৈবখাদ্য চক্রের মাধ্যমে মানুষের দেহেই ফিরে আসছে। যার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্লাস্টিক বর্জ্যসহ আমরা যে প্রতিনিয়ত চা, কফি, জুস, মুদির দোকানের পলিথিন ব্যবহার করছি তা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। ফলে দূষিত হচ্ছে মাটি। যার প্রভাব পড়ছে আমাদের জীববৈচিত্র্যের ও জলবায়ুর উপর। বেড়ে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মেডিকেল বর্জ্যসহ প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যবহৃত এসব বর্জ্য ভূমি ক্ষয় করে। জমির উর্বরতা কমে গেলে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে খাদ্যসঙ্কট। যা আমাদের অর্থনীতে চরম প্রভাব ফেলবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেঁচে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

সরকার দেশে উৎপন্ন মেডিকেল বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮' প্রণয়ন করেছে। নীতিমালায় বলা আছে চিকিৎসা বর্জ্যসমূহকে উৎসেই পৃথকীকরণ, পরিবহনের জন্য চিকিৎসা বর্জ্য প্যাকেটের ওপর প্রতীক ব্যবহার, উপযুক্ত দহনযন্ত্র ব্যবহার, পচনশীল দ্রব্য মাটিতে পুঁতে ফেলাসহ বর্জ্য ফেলার জন্য বিশেষ কালারের রঙ দেওয়া পাত্র ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়াও ওই নীতিমালায় হাসপাতাল বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য পাত্রের বৈশিষ্ট্য, যন্ত্র চালানোর জন্য মান, নির্গমন ও নিঃসরণ মান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। দুঃখের বিষয়, নীতিমালা অনুযায়ী দেশের কয়েকটি হাসপাতাল ব্যতীত কোথাও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় না। উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও মনিটরিংয়ের অভাবে হাসপাতালগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই যেখানে সেখানে ফেলা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হাসপাতাল বর্জ্য। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০০৮ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে। অথচ হাসপাতালের অনুমোদন দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সক্ষমতা তৈরী করা হয়নি। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি সঠিকভাবে সমন্বয় না হওয়ার কারণে সেগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। আইনটি যুগোপযোগী করতে সংশোধন ও আরও সহজতর করা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থপনার জন্য কালার কোড অনুযায়ী ময়লা উৎপাদনস্থল আলাদা করতে হবে। বর্জ্য খোলা অবস্থায় পরিবহন করা যাবে না এবং হাসপাতালের নির্দিষ্ট ডাম্পিং স্টেশনে জমা করতে হবে। বর্জ্যের শ্রেণিভেদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করতে হবে। তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন বা ফেলার ক্ষেত্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে দূষণ বা সংক্রমণ না হয়। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিরাপত্তায় সব রকমের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কিছু মুনাফালোভী অসাধু চক্র ডিসপোজাল আইটেম যেমন, সিরিঞ্জ, স্যালাইন সেট, গাউন এগুলো ডাম্পিং স্টেশন থেকে সংগ্রহ করে আবার বাজারে ছেড়ে দেয় এটি মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। সাধারণ বর্জ্যগুলো শুধুমাত্র সঠিকভাবে প্যাকেজিং করে আলাদাভাবে ডাম্পিং করতে হবে। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না কর গেলে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং আমরা চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ব। এজন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের আইসোলেশন সেন্টারগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থপনা চালু করা দরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন মেনে চলা অপরিহার্য।

সঠিক ও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হতে পারে–'আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ এবং আবর্জনাই নগদ অর্থ'। উন্নত দেশগুলোতে যেমন সুইডেন ও নরওয়েতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য লাভজনক ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এজন্য তারা অন্য দেশ থেকেও বর্জ্য আমদানি করছে। বাংলাদেশেরও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত। এতে পরিবেশের সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে দেশ ও দেশের মানুষ।

সর্বোপরি চিরন্তন সত্য ,আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই ছোটবেলা থেকেই যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলার শিক্ষা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সচেতন হতে সাহায্য করবে। সরকারকে পাঠ্যপুস্তকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নির্দিষ্ট অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে এবং গণমাধ্যমে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে শিশুসহ আমাদের সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। আর এভাবেই নিরাপদ সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার চর্চা বন্ধ হবে ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে।

শেষকথা, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এখনই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, হাজারো সমস্যায় জর্জরিত স্বাস্থ্যখাতের প্রতি জনমানুষের অবিশ্বাস চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। চিকিৎসা বর্জ্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি হাসপাতাল অনুমোদনের পূর্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইনসিনারেটর, অটোক্লেভ, লিকুইড ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ আধুনিক ব্যবস্থা স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে। হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারী-কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা্ সেবা নিয়ে তাদেরকে অবশ্যই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র নিতে বাধ্য করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ জেলা-উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উৎপাদিত হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশনের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রকৃতির উদারতা ও আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা!

কাজী নাজমুল মাহমুদ*
ফাতেমা-তুজ-জোহুরা**

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে-আমার জন্মভূমি"

১৯৭১ সালে প্রায় নয় মাস রক্তাক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে যেন সত্যিই এক বিস্ময়! ষড়ঋতু-কেন্দ্রিক আবহাওয়ার বিচিত্রতা ছোট-বড় অসংখ্যা নদ-নদী, পলল ভূমি, পাহাড়ের বন্ধুর পথ যেন বাংলাদেশকে রাঙিয়ে তুলেছে এক অপূর্ব মহিমায়! প্রকৃতির এই ঈর্ষণীয় সৌন্দর্যকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে জীববৈচিত্র্য। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, বরেন্দ্র ভূমি থেকে শুরু করে সুন্দরবন, সেন্টমার্টিন যেখানেই দৃষ্টিপাত করা হোক না কেন দেখা যাবে সকল স্থানই যেন তাঁর নিজ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এই ঐশ্বর্য যেন প্রকৃতি এদেশকে দুহাত ভরে দিয়েছে! কিন্তু.....!

কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন, ছেড়াদ্বীপ; সিলেট জেলার জাফলং, লালাখাল, ভোলাগঞ্জ, রাতারগুল, বিছানাকান্দি; নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার; বগুড়ার মহাস্থানগড়; খুলনাসহ পাঁচ জেলার সুন্দরবন; রাঙামাটি জেলার সাজেক ইত্যাদি পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় স্থান হিসেবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পর্যটন স্থানেরই তাঁর নিজস্ব ভূগঠন শৈলী, উচ্চতা, আবহাওয়া, প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পর্যটন স্থানেরই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট রয়েছে এবং একস্থানের স্বকীয়তা যেমন অন্যস্থানে পরিলক্ষিত হয় না বা অনেকক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়, ঠিক তেমনি এই অনন্য বৈশিষ্টই তাঁর প্রাকৃতিক পরিবেশের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! পর্যটনের উদ্দেশ্যে যখন স্থানগুলি উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বা পর্যটকরা যখন কোনো স্থানে ঘুরতে যান তখন দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং অনেকক্ষেত্রেই আবেগের বশবর্তী হয়ে প্রকৃতি বা এমনকি নিজের জন্যেও হুমকিস্বরূপ কোন কাজ করতে পিছু পা হয় না! মানুষের এই সকল অদূরদর্শী, অসচেতনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন প্রকৃতিকে অসুন্দর করে তুলছে তেমনি সাথে সাথে সেখানে বর্তমান প্রাণিকূলকেও করেছে অনিরাপদ।

প্রকৃতির উদারতার মাঝেও আমাদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার দরুন প্রায় প্রতিটি পর্যটন এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে, দুই থেকে তিনটি পর্যটন এলাকার পরিবেশগত ক্ষতির স্বরূপ ও পূর্বের অবস্থা অতি সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্লাস্টিক বর্জ্যে ভরে উঠেছে নীল পানির এই দ্বীপ

*সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
**পরিদর্শক, পরিবেশ অধিদপ্তর

একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার

পর্যটকদের অবাধ বিচরণ ও অসচেতনমূলক কর্মকান্ডের জন্য পরিবেশের কিরূপ ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সেন্টমার্টিন! বিগত দশক থেকে শুরু হওয়া পর্যটন ৮ কিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট এই প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনকে যেন আজ এক জীববৈচিত্র্যগত কঠিন সংকটের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পর্যটকদের অবাধ বিচরণ, নৌ-ইঞ্জিনের শব্দ, সাউন্ড বক্সের বিকট আওয়াজ ইত্যাদি দ্বীপে থাকা কাছিম, শামুক, প্রবালকে যেন আতঙ্কিত করে তুলেছে! কেয়া বন উজাড় করে যে রিসোর্ট কালচারের প্রবর্তন, প্রবাল সংগ্রহ, বসতি স্থাপন, প্লাস্টিক দূষণ ইত্যাদি যে শুধু সেন্টমার্টিনের অস্তিত্বই সংকটে পতিত করছে না, বরং স্বদেশের মূলভূমিকে বিপন্ন করে তুলেছে! সরকার এই দ্বীপের পরিবেশগত উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নতুন করে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করলেও, মানুষের সহজাত উত্তরোত্তর উন্নতি না হলে, একদিন এই অপূর্ব সৌন্দর্য্য কেবল অতীত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাজেক ভ্যালি, রাঙ্গামাটি

রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত সাজেক নদীর নামানুসারে এই ভ্যালিটির নাম সাজেক ভ্যালি বা সাজেক উপত্যকা যা শুধুই সাজেক নামেই পরিচিত। বছর কয়েক যাবত দেশের যে কয়েকটি স্থান পর্যটকদেরহ হটস্পটে পরিণত হয়েছে, তাঁর মধ্যে সাজেক অন্যতম। পাঁচ থেকে ছয় বছর পূর্বেও সাজেকে পর্যটকদের থাকার জন্য কেবল অল্পকিছু রিসোর্ট বা হোটেল থাকলেও এখন সেখানে পাহাড়ের উপরে হোটেলের যেন ছড়াছড়ি; এমনকি মৌসুম বিশেষে দুই-তিন মাস পূর্বে বুকিং না দিলে হোটেল পাওয়া দায়! অথচ এখন জিলাপি থেকে শুরু করে পিৎজা সবকিছুর মেলা বসে যেন ছোট্ট এই উপত্যাকার বুকে! হ্যালিপ্যাড থেকে চাঁদের গাড়ি, মোটরসাইকেল থেকে প্রাইভেট কার, কোনটার যেন কমতি নাই এখানে! নির্বিচারে পাহাড়ের বুক চিরে হোটেল বানানো হচ্ছে, গাছপালা কেটে তৈরি হচ্ছে দোকানপাট! ফলে, পাহাড় তাঁর সৌন্দর্য হারাতে চলেছে, জীববৈচিত্র্য জ্যামিতিক হারে কমেই চলেছে ক্রমশ, প্রকৃতি তাঁর ভারসাম্য হারানোর দোড়গোড়ায় যেন বর্তমান! সাজেকের পূর্বের সবুজে ফিরিয়ে দিতে না পারলে তার মূল্য দিতে হবে পর্যটকদের, মূল্য দিতে হবে আমাদের! এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ের অতি ক্ষুদ্র সচেতনতাও বৃহৎ অনেক পরিবর্তন আনতে পারে। তাই, সাজেককে তার পূর্বের ন্যায় সবুজের সমারোহে ফিরিয়ে দিতে পরিবেশের প্রতি সকলের আন্তরিকতার কোন বিকল্প নাই!

সবুজে সজ্জিত সাজেক ভ্যালি

ভোলাগঞ্জ-সাদা পাথর, সিলেট

সিলেটের জাফলং বাংলাদেশের সকলের কাছে অতি সুপরিচিত একটি পর্যটন স্থান হিসেবে পরিগণিত। কয়েক দশক ধরে জাফলংয়ের স্বচ্ছ পানিকে ঘোলা করে, চিপস-প্লাস্টিকে পরিবেশকে নোংরা করে এবার আমাদের সিলেটের ভোলাগঞ্জে যেন কুদৃষ্টি পড়েছে। কিছু বছর হলো সেখানে দর্শণার্থীদের যেন অবাধ বিচরণ। পূর্বের জাফলংয়ের ন্যায় ভোলাগঞ্জেও সকলে গোসল করা, মাইকে গান-বাজনা করা, এদিক-ওদিক প্লাস্টিকের প্যাকেট ফেলে রাখা, স্মৃতি হিসেবে পাথর নিয়ে আসা, পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে এই জায়গাটিকে ইতিমধ্যে যেন প্রতিবেশের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছে! নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুন্দর এই প্রকৃতিকে নষ্ট না করা পর্যন্ত আমাদের এই অসভ্য স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হবে না! সেজন্য, ভোলাগঞ্জের স্নিগ্ধ এই সৌন্দর্যকে টেকসই করতে হলে সবাইকে সচেতন হতে হবে, প্রশাসনকে এগিয়ে আসা জরুরী।

ভোলাগঞ্জে শুনশান নীরবতা

সমাপনী

এদেশ সবার। সুতরাং মাতৃভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্বও সকলের। সে বিবেচনায় ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই, সরকারের একার পক্ষে সেটা করা দুরূহ। পর্যটনকে হতে হবে Responsible Tourism। তবেই যদি প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশকে রক্ষা করা যায়। পাঁচ তারকার পাঁচশত টাকা মূল্যের এককাপ চা যেমন সকলের জন্য না, তার নিজস্ব একটি মূল্যমান রয়েছে। তেমনি প্রকৃতিরও একটি মূল্যমান রয়েছে। তাকে তার মতো করে থাকতে দিলে আমরাও টিকে থাকতে পারবো। নতুবা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আমাদেরও বলতে হয়-

দাও ফিরে সে পরিবেশ,
লও এ দূষণ!

কবিতা ও ছড়া

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপের শ্রেষ্ঠ ইব্রাহিম ওয়ালিদের আঁকা চিত্র

মনিরুজ্জামান* বাদলের কবিতা

একটি সরল প্রার্থনা

একটি শ্বেত-শুভ্র শিশির ফোঁটা
পাঠাও হে পৃথ্বীনাথ!
সভ্যতার কার্বনকে বলো
ও যেন না মিশায় কলঙ্ক;
একটি স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা
বর্ষণ কর হে করুণাময়!
সীমাহীন লোভাতুর মনকে বলো
ও যেন ধৈর্য ধরে সামান্য সময়;
একটি নির্মল বায়ুভরা ভোর
দান কর হে নিরঞ্জন!
নগর সভ্যতাকে বলো
ও যেন দম আটকে রাখে কিছুক্ষণ;
একটি নরম রোদের সকাল
প্রদান কর হে বিধাতা পুরুষ!
কারখানার কালো ধোঁয়াকে বলো
ও যেন আচ্ছন্ন না করে সৌন্দর্য;
একটি কূজনভরা দুপুর
দান কর হে ভুবনেশ্বর !
পাষাণ শিকারীকে বলো
ও যেন নামিয়ে রাখে সঙ্গিন;
একটি সুবাসিত বিকাল
বিলাও হে পতিতপাবন!
সেন্টমাখা যুগলদেরকে বলো
ওরা যেন বন্ধ রাখে উৎকট মিলন;
একটি ভরা পূর্ণিমার রাত
উপহার দাও হে জগৎপিতা!
অন্তরের মেঘকে বলো
ও যেন না ফেলে কালো পর্দা ;
আমাদের যোজিত পাপমোচনে
ছড়াও তোমার ঐশী জ্যোতি
হে প্রভু করুণাকর!
সবকিছু থামিয়ে দিয়ে আবার
প্রবর্তন কর তোমার প্রথম শস্যের
সরল নিষ্পাপ জীবন চক্র!

নতুন জীবনের তাগিদে

হাতের আঙুলেরা নিশপিশ করে
মুঠভরে তুলে নেয় জীবনের বীজ,
সবটুকু আবেগ ঢেলে উর্বর জমিনে
ছড়িয়ে দেয় ভালবাসার শিষ;

শস্যের অন্তরের সুবাস মেখে
স্বর্ণালী সজের সৌরভে ভিজে
শরৎ-হেমন্তের আলপথে
হেঁটে চলে জীবন;
রঙ-বেরঙের প্রজাপতি-
মধুমক্ষিকার স্বাধীন উড়াউড়ি
স্বপ্নীল আবেশে পুষ্পের সাথে
সুবর্ণ সময়ে ঘটায় পরাগায়ন।

ফুলের রেণুর খলখল হাসিতে
উজ্জ্বল উচ্ছল নতুন প্রাণ,
মায়াবী ইশারা-অক্ষরে
গল্প-কবিতা-নাটক রচে
হাতের তিনটি আঙুল।

আঙুলেরা-
ময়ূরের পেখম মেলে ধরে রাখে
বরষার বৃষ্টিজলের প্রার্থনায়,
কচুপাতার কচি শরীর টানটান রাখে
শিশিরকে ধরে রাখার প্রত্যাশায়;
বসন্তের হাওয়ায় খুলে দেয় অবগুণ্ঠন,
জীবনের ঝুলি ভরে নিতে -
ফুরফুরে আমেজে খুশির সমুদ্র-মন্থন।

আঙুলেরা-
মুখ বুজে মাটিতে পড়ে থাকে নিশ্চল শামুক
শীতের হিম, করতলে উষ্ণতার আশ্রয় খুঁজে,
আরেকটা নতুন জীবনের তাগিদে।

*চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

দূষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ

পাশা মোস্তফা কামাল*

বিশ্বব্যাপী নামছে খরা নামছে জলোচ্ছ্বাস
দিনে দিনে হচ্ছে কঠিন মানব বসবাস।

ধরিত্রীকে শান্ত রাখা যাচ্ছে নাতো আর
বান তুফানে আঘাত হেনে যাচ্ছে যে বারবার।

কেন এমন হচ্ছে বলুন বৈরী কেন ধরা
বৃষ্টি হবার কথা যখন নামছে তখন খরা।

পৌষ মাঘে শীতের কালে নামবে যখন শীত
তখন দেখি মাঠে ঘাটে বৃষ্টি আচম্বিত।

পলিথিনের ব্যবহারে বন্ধ নদী-নালা
রাস্তাঘাটে শব্দদূষণ বন্ধ কানের তালা।

পাহাড় কেটে করছি ন্যাড়া কমছে সবুজ বন
প্রকৃতিও করছে যে তাই বৈরী আচরণ।

জলাভূমি ধ্বংস করে উঠছে বাড়ি-ঘর
নদীর বুকে উঠছে জেগে নতুন নতুন চর।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সহজ গতি রুখে
সম্ভব নয় বসত করা শান্তি এবং সুখে।

রক্ষা করে প্রকৃতি আর শ্যামল পরিবেশ
গড়তে হবে দূষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ।

*ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক ও উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

সাজেদ ফাতেমী*র গান ও কবিতা

আহ্বান

সাহসী মানুষ তেজি তরুণেরা কোথায় রয়েছো আজ
পরিবেশবাদী প্রতিবাদীরা কোথায় লুকিয়ে আজ
নীরবতা ভেঙ্গে জেগে ওঠো শোনো আমার এই আহ্বান
দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়তে চলো ধরি সবে গান॥

নদী-নালা বিল উধাও হচ্ছে উজার হচ্ছে বন
ওরে আধমরা কুম্ভকর্ণ আমার কথাটি শোন
বনদস্যুর কুঠারের ঘা লাগছে না তোর বুকে?
উপরের দিকে থুথু ছুঁড়লে পড়বে নিজেরই মুখে।
নীরবতা ভেঙ্গে জেগে ওঠো---ধরি সবে গান॥

টুটি চেপেছো জলাধার আর যতো খোলা প্রান্তরের
কান পেতে শোনো পৃথিবী বাঁচাতে ডাক এলো অন্তরের।
সর্বনাশের যতো আয়োজন নিজেই করেছো সব
বুমেরাং হবে এখনই থামাও দূষণ-মহোৎসব।
নীরবতা ভেঙ্গে জেগে ওঠো---ধরি সবে গান॥

নদীর জন্য শোকগাথা

ছোট্টবেলায় যে নদীটায় ডুব-সাঁতার খেলতাম
কী অদ্ভুত জলতরঙ্গ বয়ে যেত তার বুক চিরে!
কুলকুল শব্দে মাতোয়ারা হয়ে মনের আনন্দে
কলসীতে টলটলে জল ভরে চলে যেত রমণীরা।

চল্লিশ বছর পর নদীটার ধারে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম
মুহূর্তে বুকের ওপর দিয়ে যেন করাত চলে গেল
সম্বিৎ ফিরে দেখি- এতো নদী নয় যেন রেখা
পরে এদিক সেদিক বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘুরে দেখলাম
কেবল নদী নয়-আশপাশের বিলগুলোও চৌচির
সেগুলো ধীরে ধীরে গ্যাছে ব্যক্তিগত মালিকানায়।

এখন নদীর স্থানে নদী নেই, হয়েছে পিচঢালা সড়ক
চলছে গাড়ি, লাগছে যানজট, হচ্ছে তীব্র ধোঁয়া।

আরও কিছুদিন পর যখন ওই নদীটার কাছে গেলাম
বুকের কোথাও করাত চলল না, শীতল রক্তও বইলো না
টের পেলাম নদীর মতো আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিও
শুকিয়ে গ্যাছে, যা নদীটার মতোই বহমান মনে হতো।
মনে হলো আমি এক শুকনো পাতায় পরিণত হয়েছি
আমি যেন আমার গ্রামকে আর চিনতে পারছি না।
চিনবো কী করে? সেতো বহু আগেই হারিয়ে গ্যাছে
নাগরিক উন্নয়নের জোয়ার আর সমৃদ্ধির ছোঁয়ায়!!!

এখন সেখান থেকে বাসে চেপে ঢাকায় আসতে হয়
সবাই বলে কী অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে দেশের!
অবিশ্বাস্য তো বটেই! কিন্তু সেই স্রোতস্বিনী নদী কই?
কুলকুল শব্দে বয়ে চলা পানি? খাল-বিল, জলাশয়?
ওগুলো আর নেই- নিশ্চিহ্ন, অবলুপ্ত ও মৃতপ্রায়।

*গীতিকার ও কবি

ENGLISH ARTICLES

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় খ গ্রুপের শ্রেষ্ঠ অমৃতা সাহার আঁকা চিত্র

World Day to Combat Desertification and Drought: Global to Local Context

Dr. Md. Sohrab Ali*

Drought is "a period of abnormally dry weather long enough to cause a serious hydrological imbalance" (IPCC, 2012). It is an exceptional lack of water compared with normal conditions. The direct and indirect impacts of drought across society, economy and ecosystems are often difficult to quantify. Vulnerabilities of the food, water and energy nexus are exposed by drought, and can spill over into a social vulnerability, stability and conflict nexus. Drought impacts are intensifying as the world moves toward being 2°C warmer. When not adequately managed, drought is one of the drivers of desertification and land degradation, increasing fragility of ecosystems and social instability, especially in rural communities.

The land is life that needs due care as it provides all supports to the lives on earth. But land is often affected by natural as well as anthropogenic causes. Desertification, land degradation, and drought (DLDD) are interlinked and they affect ecosystem productivity. Around 23% of the land is no longer productive globally. Up to 40 % of the planet's land is degraded, which directly affects half of humanity, and threatens roughly half of global GDP (US$ 44 trillion). If it continues through 2050, the report projects additional degradation of an area almost the size of South America. Nation's current pledge to restore 1 billion degraded hectares by 2030 requires US$ 1.6 trillion this decade (Global Land Outlook 2).

Between 1900 and 2019, droughts impacted 2.7 billion people in the world and caused 11.7 million deaths. Currently, forecasts estimate that by 2050 droughts may affect over three-quarters of the world's population. Recent droughts point to a precarious future for the world. Food and water shortages, as well as wildfires caused by the severe drought, have all intensified in recent years." Drought puts livelihoods and ecosystems at risk and, in extreme cases, can trigger famine, displacement and conflict. So, everyone needs to know that DLDD directly affect their daily lives and that everyone's daily actions can either contribute to or help fight DLDD.

"Desertification and Drought Day" was officially declared by the UN General Assembly as "World Day to Combat Desertification and Drought" in 1997. Since then the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) has been observed the Day (17 June) worldwide with the objectives: (1) to promote public awareness of the issue, (2) to let people know that desertification and drought can be effectively tackled, that solutions are possible, and that key tools to this aim lay in strengthened community participation and cooperation at all levels and (3) to strengthen implementation of

*Director, Department of Environment

the UNCCD in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa. Drought, with a focus on early action to prevent disastrous outcomes, the UNCCD secretariat declared the theme of 2022 Desertification and Drought Day *"Rising up from drought together"*. In 2022, the global observance of the event took place in Madrid, Spain.

Making everyone resilient to drought is a core mandate of the UNCCD. To help address this challenge, it established the Drought Initiative in 2018 that focuses on: (1) setting up drought preparedness systems, particularly national drought plans, (2) working together at the regional level to reduce drought vulnerability and risk, (3) providing a toolbox that stakeholders can use to boost the drought resilience of both people and ecosystems. An Intergovernmental Working Group (IWG) on Drought was established in September 2019. It was set up to develop effective policy and implementation measures for addressing drought impacts in the context of the UNCCD.

Land Degradation and Droughts in Bangladesh: A Brief Overview

Droughts of historical significance occurred in Bangladesh

Year	Location	Damage
1791	Jessore district	Affected Jessore district, prices had risen to two and three times of their usual levels.
1865	Dhaka	Proceeded famine
1866	Bogra	Severe drought; rice production was hit hard; price went up three times its normal level.
1872	Sundarbans	With deficient rainfall, crops suffered to a great extent.
1874	Bogra	Extremely low rainfall, much greater crop failure.
1951	Northwest Bangladesh	Severe drought substantially reduced rice production.
1973	Northern Bangladesh	One of the severest in the present century; is responsible for the 1974 famine in northern Bangladesh.
1975	Bangladesh	Affected 47% of the entire country; suffered about 53% of the population.
1978-1979	Bangladesh	Severe drought; widespread damage to crops; reduce rice production by about 2 million tons; directly affected about 42% of the cultivated land and 44% of the population.
1981	Bangladesh	Severe drought; adversely affected crop production.
1982	Bangladesh	Caused a total loss of rice production amounting to about 53,000 tons.
1989	Naogaon, Nawabganj, Nilphamari and Thakurgaon of northwest Bangladesh	Dried up most of the rivers of NW Bangladesh; dust syndrome occurred for a prolonged period due to drying up the soil.
1994-1995	North-west Bangladesh	Persistent drought; caused immense damage to crops like rice and jute.

Source: Statistical Year Book 2017

Land Degradation (LD) and drought are universal phenomena and a major ecological issue which signifies the temporary or permanent deterioration in the productive capacity of the land. Realizing the urgency to deal with land degradation and drought, Bangladesh signed and ratified the UNCCD in 1994 and 1996 respectively. Department of Environment (DoE) is responsible for implementation of the convention on behalf of the Government. To this end, DoE developed draft National Action Plan (NAP) in 2005. Later, aligning with UNCCD 10-Year Strategic Plan, the government adopted updated National Action Program (NAP) for Combating Desertification, Land Degradation and Drought for 2015-2024 aiming to secure healthy environment for the present and future

generations. It also set voluntary targets for achieving land degradation neutrality by 2030 aligning with SDG 15 target 15.3. Under "Establishing National Land use and Land Degradation Profile towards mainstreaming SLM practices in sector policies" project, a study has been conducted to upgrade the NAP 2015-2024 aligning with UNCCD 2018-2030 strategic framework as "National Roadmap for Combating Land Degradation" for the period of 2021-2041. The prime goal of the study is to highlight on LD and Land use distribution of Bangladesh demonstrating practical solutions through an action plan to address and overcome issues of DLDD.

No matter where we live, the consequences of DLDD concern us because 99% of the calories every human being needs for a healthy life still come from the land and land that is healthy and resilient is the first point of defense against disasters such as droughts and flash floods, which are becoming more frequent, long and severe. So, a drought management plan is essential that prioritizes prevention and preparedness and is rooted in a green recovery rather than a reactive and crisis-based. Ensure access to related information, make drought management tools so that drought-prone areas become more resilient. Assist communities to identify, earmark, and restore degrading dryland ecosystems so at-risk communities can adapt to future droughts and reduce their impacts.

Implementation Challenges of Kigali Amendment

Md. Ziaul Haque*

Bangladesh has made significant progress in implementing its hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) Phase-out Management Plan (HPMP) and is now heading towards the implementation of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, which came into force on January 1, 2019, aims to reduce the production and consumption of non-ODS (non-Ozone Depleting Substances) powerful greenhouse gases, HCFC and thereby limiting global warming. The HPMP was developed in line with the Montreal Protocol's requirements to phase out the consumption of HCFCs, which are ODS - harmful to the ozone layer and contribute also to global warming. Under the HPMP, Bangladesh has already phased out the 100% consumption of HCFC-141b by 2015 and 35% of HCFC-22 by 2022 from its baseline consumption, and the government is expecting to phase-out about 58% of HCFC-22 by 2023. The country has established quota system for HCFC imports and has implemented regulations to control the import and consumption of HCFCs. To meet the Montreal Protocol compliance target, the government is implementing an investment project with the technical assistance from UNDP under HPMP Stge-II. Through refrigerant conversion (R-290 and R-32), the country will promote energy efficient and environment friendly technology and reduce greenhouse gas (GHG) emissions. The target of the conversion project is to phase out of 17.09 Ozone Depleting Potential (ODP) tons (around 1.73 million CO2-eq tons) from 5 air conditioning and 1 chiller manufacturing enterprises by the end of 2024.

Bangladesh is now preparing to implement the Kigali Amendment, which aims to phase down the consumption of hydrofluorocarbons (HFCs)-high global warming potential greenhouse gases, some of which are 4,000 times more potent than carbon dioxide. Kigali Amendment could avoid up to 0.4 degrees Celsius temperature increase by the end of the century. The country will soon develop its Kigali Implementation Plan (KIP) outlining the steps and timelines for phasing down HFCs in Bangladesh in line with Kigali Amendment to the Montreal Protocol.

To support the implementation of the KIP, Bangladesh is receiving technical and financial assistance from international organizations and bilateral agencies. Bangladesh has received financial support from Montreal Protocol Multilateral Fund (MLF) and Canada to implement enabling activities (EA) for the implementation of Kigali Amendment. Canada provided bilateral support for the ratification and early implementation of the Kigali Amendment on the phase-down of HFCs. Under EA Bangladesh has already ratified Kigali Amendment on 08 June 2020 and enacted a SRO to

*Director, Department of Environment

control import, export and consumption of HFCs. Bangladesh has already established licensing system for import of HFCs, and new HS codes for different HFCs are included in the custom's tariff.

The government of Bangladesh decided to convert their domestic refrigeration, air conditioning (AC) and chillers manufacturing industries to R-600a, R-290/R32 and R-32, respectively. Current market penetration of such products is still relatively low, but it is expected that the demand will increase rapidly in the future. Technicians that handle these types of AC-refrigeration equipment have been trained by various training programmes. The training has also contained component of policy sensitization being carried out by the Department of Environment (DoE). These trainings were critical to start forming an initial basis of qualified technicians that can support the deployment of the new products converted by the HPMP. It also offered valuable lessons learned to the National Ozone Unit (NOU) in terms of understanding the new technological needs for these types of products, how to properly and safely install and maintain flammable-based equipment, necessary actions that can increase the life cycle of the products and to maintain the intended energy efficiency performance. These lessons learned are expected to be applied in future capacity building activities under the KIP implementation.

Earlier Bangladesh undertook a conversion project which converted HFC-134a to isobutane as refrigerant in manufacturing household refrigerator and of reciprocating compressor of HFC-134a to energy efficient compressor (isobutane) in Walton Hi-Tech Industries Limited. This funding was provided by the MLF. This was the first HFC phase-down investment project in support of the Kigali Amendment, assisting Bangladesh Walton Hitech Industries Limited, to convert the refrigerant used by this domestic refrigerator manufacturing facility from HFC-134a to isobutane (R-600a), including the conversion of its compressor manufacturing facility. Walton has an installed capacity of 3 million units of domestic refrigerators and 4 million compressors. UNDP provided the technical support to the project, which started in January 2018 and was operationally completed in December 2019. The conversion has successfully phased-out 197.30 metric tons of HFC-134a at Walton, with additional reduction of 33.30 metric tons of HFC-134a per annum in the servicing sector as an additional early phase-down commitment from the Government of Bangladesh. In terms of accumulated direct emissions, following the Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) Methodology, the conversion from HFC-134a to HC-600a at Walton would avoid the direct emission of around 08 million tons of CO2-equivalent of HFC-134a from 2020 to 2050. A complementary K-CEP project also supported the development of improved design of the fixed-speed compressors to increase the energy efficiency performance of domestic refrigerators. The re-design of refrigerator and the compressor has resulted in10% to 30% energy savings from baseline induction-based compressors. As result, based on the minimum increased energy efficiency of 10%, the new refrigerators are estimated to avoid the indirect emissions of, at least 350.26 billion tons of CO2-equivalent from 2020 to 2050.

It is essential for Bangladesh to have a comprehensive HFC phase-down plan or Kigali HFC Implementation Plan (KIP) to meet the Kigali Amendment's obligations. The 90th Executive Committee (ExCom) in July 2022 approved for Bangladesh a total of around USD 2.33 million (USD 2,332,405) for the preparation of KIP for which UNDP is the lead implementing agency and UNEP will be the cooperating agency. The preparation of Bangladesh's KIP Stage I aims to assist the country to carry out a nation-wide survey of HFC consumption in the manufacturing and servicing sectors with analysis of the data to understand the current use, and to estimate the future trends of HFCs consumption by substance and by sector as well as to obtain information on HFC related policies and country's challenges in the phase-down of HFCs in relevant sectors. UNDP will carry out the necessary surveys, data collection and consultation and validation by relevant stakeholders. Information obtained from the survey will be used to develop the overarching national strategy for the phase-down of HFCs as well as a plan of action for Stage I of KIP to address the freeze target and the 10% reduction target in HFC consumption by 2024 and 2029 respectively. The overarching strategy of the KIP will build on the achievements of the Enabling Activities for HFC Phase-down project, which aimed to assist the country to meet its initial obligations under the KA and the infrastructures that have been built from HPMP taking into account additional intervention needed for phasing down of HFCs. Recently a proposal submitted by Cuba for the adjustment to the Montreal Protocol to make the selection of baseline years for HFCs for Article 5 due to be considered at 35th Meeting of the Parties (MOP) to the Montreal Protocol be held this year. The main reason for this proposal is to consider the reality that during COVID-19 pandemic there was economic contraction and reduced imports of refrigerant gases compared with pre-pandemic years. So, it is important for Bangladesh as well in order to set the appropriate baseline taking into account pre-pandemic HFC consumption.

The Kigali Amendment presents challenges for developing countries, including Bangladesh, as they may face economic and technological obstacles that prevent them from transitioning to alternative technologies and refrigerants. Bangladesh may also face challenges in terms of financing and capacity building to support the transition to low-global warming potential alternatives. Implementing the HPMP and the KIP simultaneously in developing countries can be a challenging task. However, it is crucial to ensure a smooth and efficient transition to alternative technologies and refrigerants that have a lower impact on the environment.

Some key challenges for the implementation of KIP as follows:

- Most of the servicing sector is highly informal, resulting in little capacity and knowledge of ozone and climate-friendly technologies and servicing practices, thus creating a major barrier to the adoption of such technologies.

- Lack of awareness by the end-users (consumers) on ozone and climate-friendly Refrigeration and Air Conditioning (RAC) technologies has been a barrier to the uptake of environmentally friendly refrigerants and energy-efficient RAC equipment.

- There is a need for strengthening institutional frameworks between the NOUs and other relevant government agencies and stakeholders for improving the implementation of Montreal Protocol related policies and regulations. Furthermore, new stakeholders and partnerships need to be fostered to achieve synergies of Montreal Protocol obligations with climate change and energy efficiency goals.

- Geographic positioning and sharing of porous borders make monitoring and prevention of illegal ODS trade challenging.

- Challenges in advancing trade controls through digitalization of ODS/HFC licensing and quota systems due to limited connectivity in the country or lack of adequate capacities.

- Challenges in promoting equal opportunities for men and women in the industry.

- During the COVID-19 pandemic, economic conditions in Bangladesh was affected to various extents leading to reductions in HFC consumption during the baseline years (2020-2022). However, consumption of HFCs is potentially increasing due to businesses resuming post-pandemic and economic growth in the region. It is essential to closely monitor the growth of HFC consumption to ensure the freeze obligation in 2024 while maintaining economic growth.

- The main challenges in implementing both plans are the lack of financial and technical resources. These can make it difficult to carry out the necessary research and development required for identifying and adopting the most suitable alternatives to HCFCs and HFCs.

- Another challenge is limited capacity to enforce regulations and standards, which can affect the effectiveness of the HPMP and KIP.

- The private sector may have limited knowledge and awareness of the issues related to ozone depletion and climate change, which can hinder their ability to adopt alternative technologies and refrigerants.

To address these challenges, it is important for Bangladesh to receive adequate support from international organizations and developed countries. This can take the form of financial and technical assistance, capacity building, and training programs to help develop the necessary skills and knowledge required to implement the HPMP and KIP effectively. Additionally, efforts

should be made to raise awareness among stakeholders, including the private sector, about the importance of adopting alternative technologies and refrigerants. Overall implementation of the HPMP and KIP simultaneously in developing countries requires a concerted effort from all stakeholders. By providing the necessary support and resources, it is possible to achieve a smooth and efficient transition to alternative technologies and refrigerants that have positive impacts on the environment and contribute to a sustainable future.

Sources:

1. https://www.unido.org/sites/default/files/2019-05/HCFC_Phase-out_and_Kigali_Amendment_Implementation_ %28July_2018%29.pdf
2. https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/low-global-warming-potential-refrigerants-in-developing-countries.html
3. https://www.researchgate.net/publication/343773671_The_challenges_of_transitioning_to_low-global-warming_potential_alternative_refrigerants_in_developing_countries
4. https://www.igsd.org/wp-content/uploads/2018/09/IGSD-HPMP-KIP-Workshop-Report-2018.pdf
5. https://ozone.unep.org/kigali-amendment-implementation-begins
6. https://www.nrdc.org/bio/sameer-kwatra/implementing-kigali-amendment-key-issues-india
7. http://www.multilateralfund.org/91/Agenda%20item%207%20a%20iii%20UNDP/1/9114.pdf
8. UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40
9. UNEP/OzL.Pro.WG.1/45/7

Bangladesh is now POPs Pesticide Dichlorodiphenyltrichloroethane FREE!!

Farid Ahmed*

Background

In 1985 the Government of Bangladesh, through the Asian Development Bank (ADB) financed project implemented by the World Health Organization (WHO), imported around 500 tonnes of the notoriously toxic and currently illegal pesticide Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), and stored in Chattogram Government Medical Sub-depot (MSD). The stockpile has

*Director, Department of Environment

remained there since, where due to the adverse effect of a humid tropical climate on DDT molecular stability the stock has become severely degraded and largely obsolete. In addition, after 1991 the area was exposed to several events of heavy rainfall and floods that exacerbated greatly the problem by flushing DDT into the surrounding environment. DDT persists in soil, water and bio-accumulates in organisms through the food chain. Eventual consumption by humans has toxic and likely carcinogenic effects. Bangladesh has one of the highest population densities of any country in the world and the port city of Chattogram is the second largest city of Bangladesh. DDT stockpile was in the centre of the city. People living in slums surrounding the depot until recently will very likely have been exposed to DDT. The stockpile poses a very high risk to human health and ecosystem function. The increased frequency of flooding in the area driven by climate change makes action to prevent further release very urgent.

The Disposal of DDT

The DDT disposal is a complex and highly technical operation that took considerable expertise and planning and was the first of its kind in Bangladesh. This involved evacuating premises where the DDT waste was stored, packing the waste by employing an international technical team, obtaining approval from countries through which the waste shipment crossed ports, and finally executing the shipment of the packed waste through a waste facility in France.

During the initial phase, several queries were made to verify the existence of additional stockpile of obsolete Persistent Organic Pollutants or POPs pesticides. A reassessment of the existence of other obsolete pesticide stockpiles in Bangladesh was carried out with the support of the Department of Agricultural Extension (DAE) and Plant Protection Wing (PPW) of DAE and Public Health Department verified that the MSD contains the last remaining stockpile of DDT.

FAO then procured safeguarding, packaging and disposal services. This procurement was done through international bidding of services and selection was made in compliance with GEF standards and ensuring that the selected company had certified experience of safeguarding and destruction of POPs pesticides in an environmentally sound manner.

The appointed contractor, in close cooperation with the Department of Environment and FAO, prepared an Environmental Management Plan (EMP) that specified all the measures that was put in place to protect people and the environment during the clean-up. This included barriers and early warning systems and was put in place as soon as the operation was confirmed. It also specified the Personal Protection Equipment (PPE) for the workers and measures for protecting local people during operations.

An **Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)** was carried out for the safeguarding, packaging, transportation and environmentally sound disposal activities, based on the FAO Environmental and Social Management guidelines, including disclosure requirements. The ESIA was prepared and submitted by the Disposal Service Contractor.

Alternative offices and storage facilities for DGHS staff who had been stationed at the MSD was identified. The need for them to be evacuated during operations was due in part to the health hazard of DDT airborne dust release, making it necessary to relocate the staff and storage to alternative office space duration of the operations. In addition, medical and other goods that are also on site were moved to alternative storage space for the duration.

Establishing a hazardous waste (HW) manifest system for the mobilization of the DDT waste. In Bangladesh there is currently no HW manifest system for keeping track of the generation, transportation, storage and disposal of hazardous waste. The establishment of this system for project purposes allowed piloting an HW manifest system for hazardous waste in general.

An exhaustive classroom and on-field training covering all the aspects of the safeguarding, repackaging, and storing and transport operation was held for staff from DoE, Chattogram Fire Service, Chattogram Metropolitan Police and Civil Surgeon. The training was particularly important as it is envisaged to involve staff hired from the local population.

Safeguarding of the entire DDT stockpile of the Chattogram MSD storage facility was then carried-out in phases considering the available space for storing repackaged DDT, other necessary resources and human capacity. Sixteen workers were hired by the disposal company and trained on the packaging process. The workers were closely supervised the technical team of the disposal company who took over the disposal operations in MSD.

Prior to the beginning of the DDT shipment process, 14 countries had to give their permission for the ship carrying the waste to transit through their territorial waters. France being one of only a handful of countries that has the capacity to dispose of DDT safely and having the provision to allow the import of hazardous waste from other countries according to international guidelines (Stockholm Convention) was selected for the destruction of the DDT. Countries that received notifications letters are:

Sl.	Department/Division/Ministry	Country
1	General Directorate Of Environmental Impact Assessment, Permit And Audit; Import and Export Permits Unit	Turkey
2	Environment Pollution Control and Chemical Management Division, Ministry of Mahaweli Development and Environment	Sri Lanka
3	Environmental Policy Division, Ministry of Sustainability and the Environment	Singapore
4	Department of Environment, Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change	Malaysia
5	International Cooperation Department, Waste Management Regulatory Agency (WMRA), Ministry of Environment (MOE)	Egypt
6	Environment and Resources Authority (ERA),	MALTA
7	Department for Waste Management, Ministry of Environment, Land and Sea	Italy
8	Ministry Of Agriculture And Environment Affairs	Spain
9	Department of Wastes, Agência Portuguesa do Ambiente	Portugal
10	Département de l'Environnement, Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement	Morocco
11	Environment Agency, TFS National Service	United Kingdom
12	ILT/Handhavingsbeleid/EVOA en Besluiten vergunningverlening, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu	The Netherlands
13	Interregionale Verpakkingscommissie (IVC), Commission interrégionale de l'Emballage (CIE), Interregionale Verpackungskommission (IVC-CIE), Interregional Packaging Commission (IVC-CIE)	Belgium
14	Übereinkommen Wörlitzer Platz 1, Umweltbundesamt Anlaufstelle Basler	Germany

The DDT shipment took place in 3 phases to France. The final weight of DDT being shipped off stood at 526 tons. A closing workshop was formally organized to conclude field operations of DDT. In this workshop, all relevant government institutions, non-governmental organizations and workers are recognized for their contribution. The Ministry of Environment Forest and Climate Change held a press briefing on 8 January 2022 where the country was declared DDT free.

Currently, characterizing of the site post-operations is being done through an assessment that has been outsourced to a technical team from leading academic institution that has expertise and experience of working with pesticide analysis. Samples have been taken from inside each storage building including wipe tests on the walls; soil sampling outside the buildings, inside and outside

the storage facility have been taken for the analysis. Surface water and groundwater quality testing is also being conducted. A detailed characterization of the site post-operations has already been presented to FAO.

Disposal of DDT from Bangladesh

The Department of Environment, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bangladesh has successfully completed a complex international operation in disposing Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) in an environmentally manner under Pesticide Risk Reduction in Bangladesh Project with financial assistance from Global Environment Facility and technical assistance from FAO . What is thought to be the world's largest remaining stockpile of the now-banned pesticide DDT, left in Chattogram city for 37 years, has finally been removed.

	Shipment 1	Shipment 2	Shipment 3
Date	October 30, 2022	November 17, 2022	December 10, 2022
No. of Containers	6	11	7
No. of Bigbags	240	440	216
Quantity (tonnes)	Gross- 138.5 Net-133.2	Gross- 255.1 Net-244.1	Gross- 153.6 Net-148.2

Pesticide Risk Reduction in Bangladesh project

The development objective of the project is increased food security through the elimination of POPs pesticides stockpiles and the implementation of safe alternatives for food preservation and agricultural practices. The project's objective is to reduce risk to human and animal health and the environment from stockpiles of POPs and other obsolete pesticides and from ongoing excessive use of new POPs and other highly hazardous pesticides. More specifically the project aims to

reduce the risk to human and animal health, and the environment through the environmentally sound elimination of 526 tons of POPs pesticides including DDT.

The Department of Environment (DoE) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) became the lead government executing and coordinating agency for this project. In light of this, DoE has played the overall leading role in the execution of project activities as well as the overall coordination and monitoring at national level.

The project is built around four components. The first component addresses the disposal of legacy stockpiles of POPs. The second component aims to strengthen governance and enforcement with respect to pesticide laws and regulations. The third component will work to create alternatives for pesticide usage. The forth component will focus on building awareness and communication.

Building A Resilient Future: Establishing A National Mechanism for Loss & Damage in Bangladesh

Md. Mahmud Hossain*

Introduction

Loss and damage (L&D) refer to the adverse consequences and impacts of the inability to cope with or adapt to climate change effects. It includes both tangible and intangible losses experienced by individuals, communities, and countries due to climate-related events like extreme weather as well as slow-onset events. L&D goes beyond what can be addressed through adaptation measures, leading to irreversible damages, loss of lives, livelihoods, ecosystems, cultural heritage, and infrastructure. It represents the lasting impacts of climate change that necessitate additional attention and support beyond traditional mitigation and adaptation efforts.

The issue of loss and damage gained significant attention under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at COP13 in 2007. In 2013, the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage [1] associated with Climate Change Impacts was established to address the issue of loss and damage in the most vulnerable countries and communities. The mechanism aims to enhance knowledge and understanding of loss and damage, strengthen cooperation and coordination, and enhance the availability of financial and technical support for addressing loss and damage.

The COP27 achieved a breakthrough agreement on funding arrangements for addressing loss and damage caused by climate change, specifically targeting vulnerable developing countries. A transitional committee was established to provide recommendations on operationalizing the funding arrangements. The funding arrangements for addressing loss and damage will open opportunities for vulnerable countries like Bangladesh. By effectively utilizing the funds, Bangladesh can strengthen its capacity to mitigate and manage climate impacts, protect vulnerable populations, and promote sustainable development. The funding presents a crucial opportunity to enhance resilience, implement targeted initiatives, and improve adaptive measures. Prioritizing strategic allocation will ensure a maximum positive impact on vulnerable communities, facilitating Bangladesh's journey toward a sustainable and resilient future.

Climate Change Vulnerability in Bangladesh

Bangladesh is one of the countries most vulnerable to climate change impacts, with frequent natural disasters, including floods, cyclones, storm surges, and landslides. These events cause significant damage to infrastructure, agriculture, and livelihoods, and they also pose a significant threat to

1 https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/cp23_auv_i7.pdf

*Deputy Director, Department of Environment

human lives. The loss and damage caused by climate change impacts have been estimated to cost the country around 2% of its GDP each year.

According to IPCC's Sixth Assessment Report [2] (AR6), Bangladesh faces the following vulnerabilities due to climate change:

- Almost 26 million people are currently exposed to very high salinity in shallow groundwater in coastal Bangladesh.
- Many low-lying coastal aquifers are contaminated with increased salinity due to land-use change, rising sea levels, reduced stream flows, and increased storm surge inundation.
- Indo-Gangetic Basin reveals that sustainable groundwater supplies are constrained more by extensive contamination (e.g., arsenic, salinity) than depletion.
- Between 2012 and 2050, the freshwater river area is expected to decrease from 40.8% to 17.1% in the southwest coastal zone of Bangladesh.
- The agricultural sector is most likely to face significant yield reduction in the future due to climate variability.
- In 2017, floods affected 220,000 ha of nearly ready-to-be-harvested summer paddy crops, resulting in a 30% year-on-year increase in paddy prices.

Bangladesh is highly vulnerable to both slow-onset and extreme weather events, which can cause significant loss and damage. Slow-onset disasters are events that develop over an extended period, such as sea-level rise, salinity intrusion, and desertification. Extreme weather events, such as cyclones, floods, landslides, and droughts, occur suddenly or with little warning.

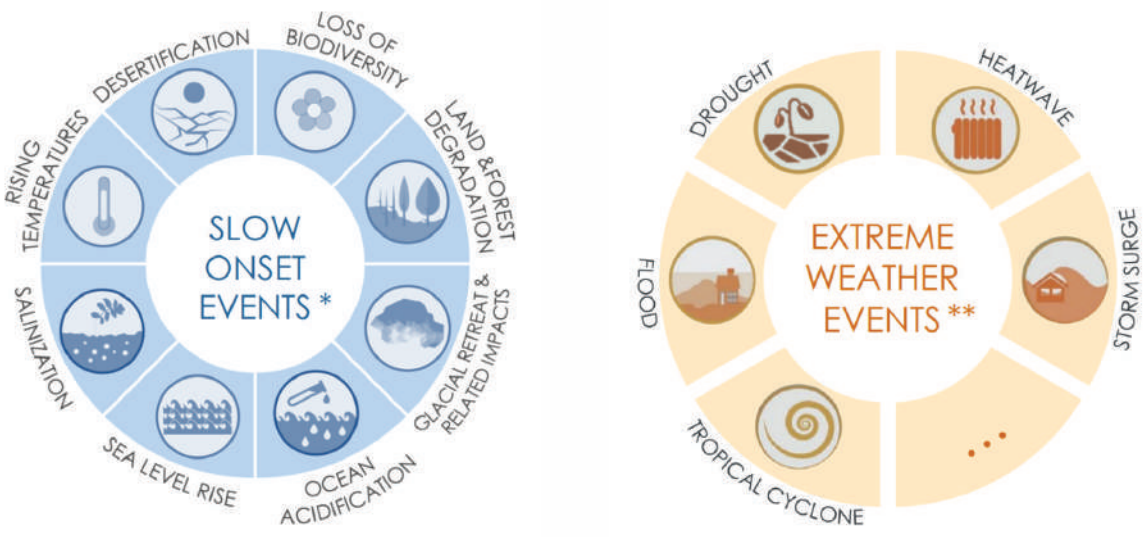

Figure 1: Slow-onset events and extreme weather events (source: UNFCCC, 2018)

Slow-onset events profoundly impact Bangladesh's economy, infrastructure, and livelihoods. For example, sea-level rise and salinity intrusion are causing widespread damage to coastal ecosystems, reducing the availability of freshwater resources, and impacting agricultural productivity. Moreover, desertification is reducing agricultural productivity and increasing the risk of food insecurity. Extreme weather events, such as cyclones, floods, landslides, and droughts, also significantly threaten Bangladesh. These events cause widespread damage to infrastructure, agriculture, and livelihoods and significantly threaten human lives. The loss and damage caused by extreme weather events require immediate action to address affected communities' emergency response and recovery needs. This includes the provision of emergency shelters, food, water, and medical assistance, as well as restoring damaged infrastructure and diversifying livelihoods.

Harnessing Strength in Adversity: A National Mechanism to Address Loss and Damage in Bangladesh

Bangladesh, a climate-vulnerable country, urgently needs to develop a comprehensive national mechanism to address the loss and damage issues raised by climate change. An outline of the key elements of such a mechanism, including institutional arrangements and funding sources, along with a possible action plan, could be as follows:

A. Institutional Arrangements:

A well-defined institutional arrangement is essential to address loss and damage in Bangladesh effectively. The following stakeholders will have designated roles:

- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC): The ministry could lead the overall coordination and policy development related to loss and damage. It will ensure the integration of loss and damage considerations into national climate change adaptation and mitigation plans.
- Ministry of Disaster Management and Relief (MoDM&R): This ministry could focus on disaster risk reduction, emergency response, and recovery measures to mitigate loss and damage. It will collaborate with relevant stakeholders to ensure a coordinated and effective approach.
- Department of Environment (DoE): The department could play a vital role in assessing and monitoring climate-related loss and damage, including conducting vulnerability assessments, impact studies, and data collection. It will provide technical expertise and support in implementing the mechanism.
- Department of Disaster Management (DDM): This department could work closely with the Ministry of Disaster Management and Relief to enhance disaster preparedness, early warning systems, and capacity-building efforts. It will contribute to risk assessment and management strategies.

- Academia: Academic institutions can contribute to research, knowledge generation, and capacity-building initiatives related to loss and damage. They will provide evidence-based insights and support the development of innovative solutions.
- Non-Governmental Organizations (NGOs): NGOs can actively engage in on-the-ground activities, including community outreach, capacity-building, and implementation of adaptation and resilience measures. They will ensure the inclusion of marginalized and vulnerable communities.

B. Funding Arrangements:

Sustainable financing is critical to address loss and damage effectively. Bangladesh will identify funding arrangements from both international climate finance and national sources.

- International Climate Finance: Bangladesh will tap into international climate funds, such as the Green Climate Fund (GCF), or other financial sources that will be dedicated to addressing Loss & Damage in vulnerable countries. The government will actively engage in international climate negotiations to advocate for increased financial assistance for loss and damage.
- National Fund: Bangladesh can establish a dedicated national fund to finance loss and damage interventions. If not, Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) could also support addressing loss and damage. The government will allocate a portion of its national budget to this fund, ensuring a sustainable and predictable funding source. Additionally, innovative financing mechanisms, such as climate risk insurance and public-private partnerships, may be explored to supplement the national fund.

Developing a national mechanism for addressing loss and damage in Bangladesh requires a collaborative effort involving key stakeholders. By establishing well-defined institutional arrangements and securing funding from international climate finance and national sources, Bangladesh can enhance its resilience to climate change impacts and effectively address loss and damage, ensuring a sustainable future for its citizens.

C. Preparing a National Action Plan for Loss and Damage

Given the severity of the impacts of climate change on Bangladesh, it is critical to formulate a National Action Plan for Loss and Damage to address the country's vulnerabilities and mitigate the impacts of future events. The plan will provide a framework for identifying and addressing the most pressing challenges. It will also help prioritize actions based on their potential to reduce risks and losses. Moreover, it will align with the country's national development priorities, National Adaptation Plan (NAP) 2023-2050, Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) 2022-2041, and its commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Formulating a National Action Plan for Loss and Damage will enable Bangladesh to access international climate finance to support the implementation of the plan. International climate finance can provide additional resources to support the country's efforts to address loss and damage, including financing for early warning systems, climate-resilient infrastructure, and livelihood diversification. The plan will help prioritize actions and mobilize resources to mitigate the risks and losses associated with climate change impacts while supporting the country's national development priorities and its commitment to the Sustainable Development Goals. To work toward formulating a National Action Plan for Loss and Damage, the following actions could be undertaken:

- Conduct a Comprehensive Assessment: The assessment should include an analysis of climate change impacts, risks, and potential damages in different sectors and regions of Bangladesh. This could involve gathering information from a range of sources, such as climate models, historical data, stakeholder consultations, and scientific research. The assessment should also consider social, economic, and environmental factors that may influence vulnerability and the potential for loss and damage.
- Identify Priority Areas: Once the assessment is complete, priority areas should be identified based on the severity of the impacts, the level of vulnerability, and the potential for loss and damage. This could involve ranking sectors or regions according to their priority for action. The prioritization process should be transparent, inclusive, and based on scientific evidence and stakeholder feedback.
- Develop Goals and Objectives: Goals and objectives should be developed based on the identified priority areas. These goals and objectives should be aligned with Bangladesh's national development priorities and the SDGs. They should also be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART).
- Develop a Strategy: The strategy should outline the actions that will be taken to achieve the goals and objectives, the actors responsible for implementing these actions, the resources required, and the timelines for implementation. The strategy should also consider any institutional and policy frameworks needed to implement the plan. The strategy should be based on a comprehensive and participatory process involving stakeholders from different sectors and regions.
- Mobilize Resources: The resources needed to implement the National Action Plan for Loss and Damage should be mobilized from different sources. This could include domestic resources, international climate finance, and other funding sources. The mobilization of resources should be based on a comprehensive and transparent process that considers the priorities and needs of different sectors and regions.
- Establish a Monitoring and Evaluation System: A monitoring and evaluation system should be established to track progress and ensure that the National Action Plan for Loss and Damage achieves its objectives. The system should include indicators for measuring progress, regular reporting mechanisms, and periodic reviews to adjust the plan as necessary.

- Ensure Stakeholder Engagement: Stakeholders from different sectors and regions should be engaged in developing and implementing the National Action Plan for Loss and Damage. This will help to ensure that the plan is responsive to the needs and concerns of all stakeholders and that it is inclusive and participatory.

Developing a National Action Plan for Loss and Damage in Bangladesh will require a comprehensive and participatory approach that engages stakeholders from different sectors and regions. The plan should be based on a transparent and evidence-based process that considers the social, economic, and environmental factors that may influence vulnerability and potential loss and damage.

D. Preparing a National Strategy and Action Plan for Climate-Displaced Population

The National Strategy and Action Plan for the climate-displaced population in Bangladesh is crucial for addressing the challenges and impacts of climate change-induced displacement. It provides a comprehensive framework for identifying, protecting, and supporting the rights and needs of those who are forced to relocate due to climate-related factors. This strategy and action plan play a vital role in ensuring the well-being, safety, and resilience of climate-displaced populations in Bangladesh, promoting sustainable development, and fostering adaptation measures to mitigate future displacements.

Developing a National Strategy and Action Plan for a climate-displaced population requires a systematic and inclusive approach. The following steps can be taken to move forward in developing such a plan:

- Assessment and Research: Conduct a comprehensive assessment to understand the scope and magnitude of climate-induced displacement in Bangladesh. This includes analyzing climate change projections, vulnerable regions, and the socioeconomic impact on affected communities.
- Stakeholder Engagement: Engage with various stakeholders, including government agencies, NGOs, local communities, and experts, to gather diverse perspectives and ensure inclusive decision-making. Seek input from climate-displaced populations themselves to understand their specific needs and challenges.
- Legal and Policy Framework: Review existing laws, policies, and international frameworks related to climate-induced displacement. Identify gaps and develop new policies or amend existing ones to provide the affected populations with legal protection, rights, and support mechanisms.
- Capacity Building: Enhance the capacity of relevant government departments, NGOs, and local authorities to address the unique challenges posed by climate-induced displacement. This includes training on disaster risk reduction, climate adaptation, relocation strategies, livelihood support, and social protection.

- Data Collection and Monitoring: Establish a robust data collection system to monitor and track climate-induced displacement. This includes developing indicators, data collection methods, and reporting mechanisms to assess the effectiveness of the strategy and action plan.
- Resilient Infrastructure and Land Use Planning: Integrate climate resilience considerations into infrastructure development and land use planning. This involves identifying safe and suitable relocation sites, implementing sustainable infrastructure projects, and ensuring access to essential services and resources for climate-displaced populations.
- Livelihood and Social Support: Develop programs and initiatives to support climate-displaced populations' livelihoods and socio-economic well-being. This can include vocational training, job placement assistance, social safety nets, and access to basic services such as education and healthcare.
- International Cooperation: Engage with international partners, organizations, and initiatives focused on climate-induced displacement to exchange knowledge, share best practices, and seek financial and technical support for implementing the strategy and action plan.
- Awareness and Advocacy: Conduct public awareness campaigns to educate the broader population about climate-induced displacement and the importance of addressing the needs of affected communities. Advocate for policy changes, funding, and resources to support the strategy and action plan implementation.
- Regular Review and Adaptation: Continuously monitor, evaluate, and review the effectiveness of the strategy and action plan. Adapt and update the plan based on changing climate conditions, emerging challenges, and lessons learned from implementation.

By following these steps, Bangladesh can develop a comprehensive and effective National Strategy and Action Plan for the climate-displaced population, ensuring the protection, rights, and well-being of those affected by climate change-induced displacement.

Conclusion

Bangladesh needs to establish a comprehensive national mechanism to address the loss and damage caused by climate change. The mechanism should include well-defined institutional arrangements involving the role of key stakeholders. Developing a national mechanism for loss and damage in Bangladesh will enhance the country's resilience to climate change impacts by effectively addressing and managing the loss and damage caused by extreme weather events as well as slow-onset events. Also, the mechanism will target improved response and recovery by ensuring a coordinated and efficient approach to assist and support affected communities promptly. Additionally, it aims to provide financial support through appropriate mechanisms to fund the recovery and rehabilitation efforts. By establishing a robust national mechanism, Bangladesh aims to minimize the adverse effects of climate change and build a more sustainable and secure future for its people.

Nature-based solution in mitigating the increase of CO_2 in the atmosphere originating from anthropogenic emissions

Muha Abdullah Al Pavel*
Kamrun Nahar Mukta**

Background

Today, many of scholars and researchers regard climate change as an indisputable fact and consider it to be the most significant challenge that humanity has ever confronted (e.g., Chapin, 2003; Costa et at., 2009; Nunes et al, 2020). The consensus among experts is that human activities, specifically the emission of greenhouse gases, are the primary cause of the acceleration of the process of climate change (Figure 1a). Thus, there is an urgent need to address and find solutions to mitigate climate change, particularly because the severe impacts of climate change have already been experienced, often in the form of extreme weather events with devastating consequences. Forests are widely recognized as one of the most efficient and straightforward nature-based solutions for providing the function of carbon sinks (Figure 1b) (Nunes et al, 2020). Thus, the aim of this study is to investigate the limitations and capacity of forests to serve as a carbon sinks, as well as to understand the differences in carbon storage across the biomes, by review of the existing a few literatures. To provide guidance for development of this study and achieve the statement mentioned above, the following questions were explored:

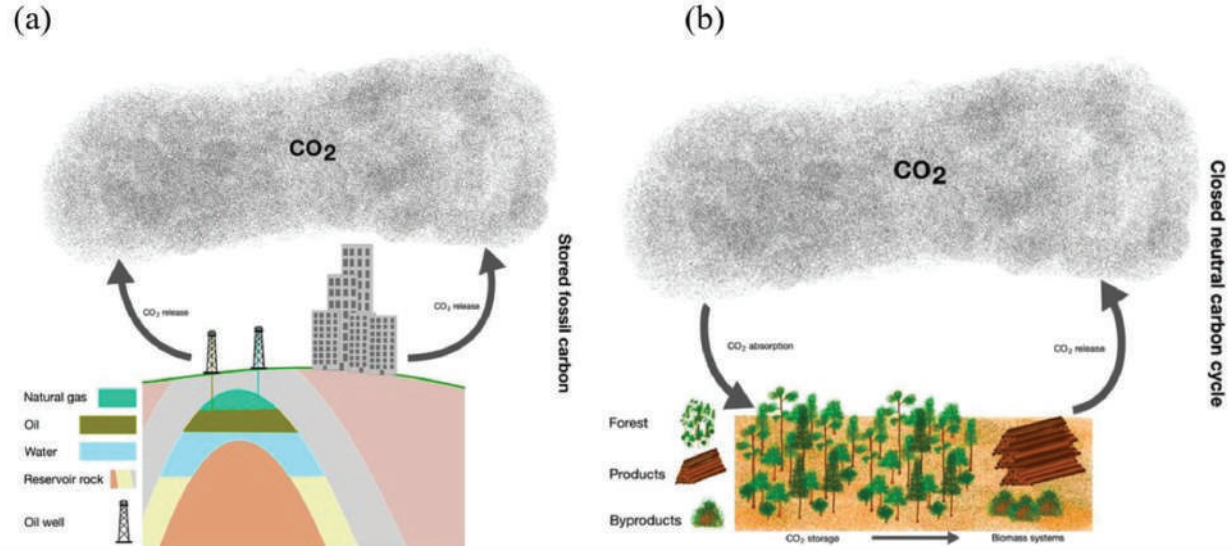

Figure 1: (a) The leading cause of accelerating climate change is most likely the release of carbon that has been sequestered and stored for a long time in the past, (b) Forests are capable of creating their own carbon cycle through photosynthesis as trees and plants absorb CO2 from the atmosphere,

*Forest Research Centre (CEF), School of Agriculture (ISA), University of Lisbon, Tapada Lisbon, Portugal
**American International University Bangladesh, Dhaka

along with water and energy from the sun, to produce their own organic matter (Source: Nunes et al, 2020). Is it interacting the carbon cycle, itself, including with energy, oxygen, water, and rock cycles? Carbon is an essential element, as it is a fundamental component of organic matter, which is a critical part of all life. The movement of carbon on earth is known as the carbon cycle, which follows a specific pathway (Figure 2). The energy cycle begins with the process of photosynthesis, where radiative energy is converted into chemical energy, and atmospheric CO2 is consumed to create organic compounds. The majority of the chemical energy required for life is stored in organic compounds. These autotrophic organisms are consumed by the heterotrophic beings, thus carbon from the autotrophic goes to the heterotrophic organisms. This material along with dead animals and waste products are consumed by decomposers, they break down dead organic matters from all trophic levels. However, these C go back to earth by the respiration process performed by both heterotrophic and autotrophic beings and decomposers. In this way, the energy cycle interconnects with the carbon cycle. The water cycle refers to the series of natural processes through which water is continuously cycled and circulated between the earth's oceans, atmosphere, and land. This includes the precipitation of rain and snow, the drainage of water through streams and rivers, and the return of water to the atmosphere through evaporation and transpiration. Sulfur is contained in rocks, released via volcanic activity or by weathering (rainwater or eroded via floods) and transported via rainwater, floods and rivers etc. feeding plants and via sinking into the soil. Also, it is carried to rivers, oceans etc. abound in sediments (Nunes et al, 2020; Foster, 2023; Anonymous, 2023).

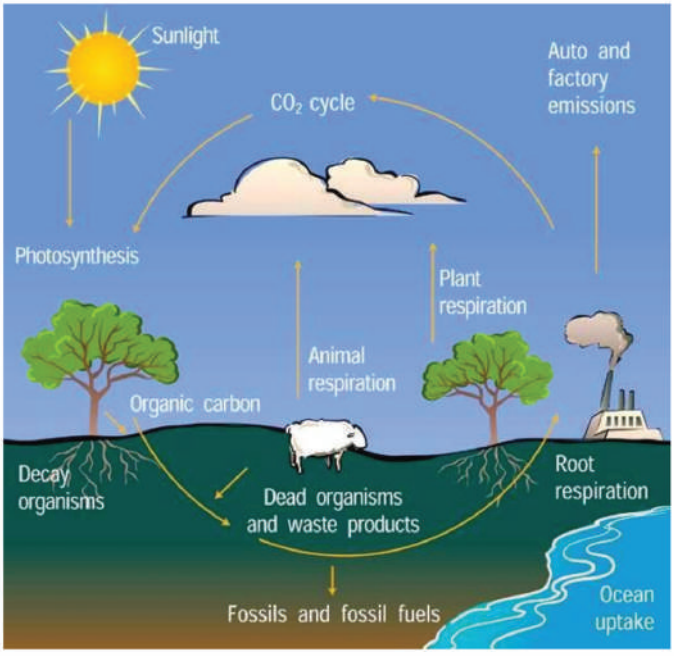

Figure 2: The carbon cycle diagram (Source: Foster, 2023)

What might be the main differences and limitations between Tropical and Mediterranean forests in relation to carbon sequestration?

Forests have a major role in reducing emissions of CO2 to the atmosphere, because forests can carbon stores in plants biomass through photosynthesis. Planting more trees can decrease the amount of CO2 in the atmosphere. In this way, we bind more CO2 from the atmosphere in biomass (Nunes et al, 2020). But cutting forests means deforestation– burning wood or decomposition is very fast in tropical forest that releases CO2 to the atmosphere. In tropical forest (e.g., the Amazon basin in South America, the Congo Basin in Central Africa, and Southeast Asia) has huge problem than Mediterranean forests (e.g., Spain, Italy, France, Spain, etc.) with deforestation means increasing CO2 emissions (Pereira et al., 2007; UCS, 2008; Feng et al., 2021).

Once more, the pace at which an ecosystem captures carbon, known as net primary production (NPP), represents the net flow of carbon from the atmosphere to the plants. NPP is calculated as the difference between the overall photosynthesis (Gross Primary Production or GPP) and the ecosystem's autotrophic respiration (Ra), and it is measured over a period, (NPP = GPP - Ra). The relationship between NPP and other ecological processes such as net ecosystem change (NEE) and heterotrophic respiration (Rh) can be expressed through the formula NEE, (NEE = NPP – Rh). The amount of primary production in terrestrial ecosystems is subject to variation based on a few factors, including climate, levels of sunlight, soil characteristics, forest structure, as well as tree biomass, density, and size. These factors can contribute to an ecosystem's ability to capture and fix atmospheric carbon (Field et al., 1995; Costa et at., 2009). The daily NPP per leaf area index (LAI) in tropical forests is lower than Mediterranean ecosystems.

TABLE 1. *Productivity per day and per unit leaf area*

Biome	Total NPP (g m^{-2} $year^{-1}$)*	Season length† (d)	Daily NPP per ground area (g m^{-2} d^{-1})	Total LAI‡ (m^2 m^{-2})	Daily NPP per leaf area (g m^{-2} d^{-1})
Tropical forests	2500	365	6·8	6·0	1·14
Temperate forests	1550	250	6·2	6·0	1·03
Boreal forests	380	150	2·5	3·5	0·72
Mediterranean shrublands	1000	200	5·0	2·0	2·50
Tropical savannas and grasslands	1080	200	5·4	5·0	1·08
Temperate grasslands	750	150	5·0	3·5	1·43
Deserts	250	100	2·5	1·0	2·50
Arctic tundra	180	100	1·8	1·0	1·80
Crops	610	200	3·1	4·0	0·76
Range of values	14-fold	3·7-fold	3·8-fold	6-fold	3·3-fold

Figure 3: Global distributions of NPP (Source: Chapin, 2003)

Once again, the daily NPP per unit of ground area in tropical forests tends to be greater than that of Mediterranean ecosystems. The NPP of an ecosystem can be influenced by the size of the leaves of the species that inhabit it. Tropical forests tend to have larger leaves, which allows them to capture more sunlight for photosynthesis, contributing to higher rates of NPP compared to other

ecosystems. Conversely, leaves in Mediterranean ecosystems tend to be smaller in size compared to those found in tropical forests. This can impact the rate of NPP in the ecosystem, as smaller leaves may not be as efficient in capturing sunlight for photosynthesis. Although tropical areas generally exhibit higher values of daily NPP and LAI, the daily NPP per leaf area can be calculated by dividing the daily NPP per unit of ground area by the LAI. Based on the formula provided earlier, if the LAI in Mediterranean ecosystems is higher than in tropical areas, then the daily NPP per leaf area could be higher in the Mediterranean despite having lower values of daily NPP per unit of ground area (Figure 3). This LAI is just one of the factors that can affect primary production, and other factors such as temperature, soil nutrients, water availability, and plant species diversity can also play a significant role. Therefore, further analysis would be necessary to make any definitive conclusions about the relative GPP and NPP of Mediterranean versus tropical forests (Chapin, 2003).

Is it possible that nature-based solution are reducing their carbon sequestration capacity, despite the increase in CO2 concentration in the atmosphere, as some studies suggest in Europe?

The processes of photosynthesis and respiration referred to as GPP and ecosystem respiration, respectively, play a crucial role in regulating the amount of carbon entering and leaving ecosystems, (Nunes et al, 2020). The variability in terrestrial carbon sequestration between years is mainly due to reduction in GPP and ecosystem respiration caused by droughts. Regions with seasonally arid climates, such as the Mediterranean, undergo droughts because of reduced precipitation and changes in seasonal timing. Under the influence of climate change, the frequency and intensity of these changes are likely to increase, leading to a greater occurrence of the Birch effect, this involves the decomposition and mineralization of organic matter, as well as the release of inorganic nitrogen and CO2, which is further facilitated by the rewetting of previously dry soil. Forests located in Mediterranean climates in southern Europe are responsible for a significant proportion of soil carbon emissions, which can result in a substantial release of CO2 into the atmosphere. For example, several studies indicate that eucalyptus plantations are known to have the highest carbon sink potential, with a NEE ranging from -861 to -399 g C m-2 year-1. Compared to eucalyptus plantations, oak woodlands and grasslands have a significantly lower carbon sink potential. The eucalyptus stand exhibited a higher GPP and a lower proportion of GPP used for respiration compared to the other systems. The elevated GPP observed in the eucalyptus stand can be attributed to its high leaf area duration, which serves as a proxy for photosynthetic photon flux density absorbed by the canopy. In addition to its high GPP, the eucalyptus stands also demonstrated greater rain-use efficiency (GPP per unit of rainfall) and light use efficiency (daily GPP per unit of incident photosynthetic photon flux density) compared to the other two ecosystems. During periods of severe drought, the reduction in GPP is typically greater than that of ecosystem respiration, resulting in a decline in NEE. While the rain-use efficiency of the eucalyptus plantation increased during the dry year, the same cannot be said for the evergreen oak woodland, where rain-use efficiency was not affected by drought (Pereira et al., 2007).

Conclusion

The findings of this research can be used to integrate our present knowledge of the impact of climate change on a regional and global level, which will give policymakers a more informed foundation to create strategies that reduce the adverse consequences of human actions on global environmental issues. One potential solution to reduce anthropogenic emissions from the atmosphere could be through nature-based solutions, such as forests.

Reference

1. Field, C.B., Randerson, J.R., Malmström, C. M. 1995. Global net primary production: combining ecology and remote sensing, Remote Sensing of the Environment, 51:74-88.

2. Chapin FS, III, 2003. Effects of Plant Traits on Ecosystem and Regional Processes: a Conceptual Framework for Predicting the Consequences of Global Change, Annals of Botany, 91(4):455–463.

3. Pereira, J.S., Mateus, J.A., Aires, L.M. et al. 2007. Net ecosystem carbon exchange in three contrasting Mediterranean ecosystems – the effect of drought, Biogeosciences, 4:791–802.

4. Foster, J. 2023. What is the Carbon Cycle in Ecology? Diagram, Definition, and Steps, https://www.jotscroll.com/what-is-the-carbon-cycle-diagram-definition-steps. [accessed on 20.04.2023]

5. Anonymous, 2023. Nitrogen, oxygen, carbon cycles. https://ecoregionproject.weebly.com/nitrogen-oxygen-and-carbon-cycles.html. [accessed on 20.04.2023]

6. Costa, M.H., Nunes E.L., Senna, M.C.A., et al. 2009. State-of-the-art simulation of the carbon fixation rate of tropical ecosystems, Revista Brasileira de Meteorologia, 24(2).

7. Nunes, L.J.R., Catarina I.R.M., Carlos J.P.G., et al. 2020. Forest Contribution to Climate Change Mitigation: Management Oriented to Carbon Capture and Storage, Climate, 8(2):21.

8. UCS (Union of Concerned Scientists), 2008. Tropical Deforestation and Global Warming, https://www.ucsusa.org/resources/tropical-deforestation-and-globalwarming. [accessed on 20.04.2023]

9. Feng, Y., Ziegler, A.D., Elsen, P.R. et al. 2021. Upward expansion and acceleration of forest clearance in the mountains of Southeast Asia, Nature Sustainability, 4:892–899.

Beewax Wrap: Potential Substitute for Plastic Wrap

Dr. Maksuda Hossain*

Plastic pollution is one of the most pressing environmental challenges of our time, with devastating impacts on the planet's ecosystems and human health. It occurs when plastic products, like, plastic bags, bottles, straws, packaging, and micro plastics are improperly disposed of, littered, or lost in the environment or it can persist for hundreds of years. One of the most significant contributors to plastic pollution is single-use plastic products, including plastic wrap. According to United Nations Environment Program, about 36% of all plastic produced is utilized in packaging, which includes single-use plastic products like food and beverage containers. Unfortunately, roughly 85% of this packaging ends up in landfills or as unregulated waste.

Plastic pollution is a significant environmental problem and has far-reaching consequences. It affects the beauty and integrity of natural landscapes, disrupts ecosystems, leach toxic chemicals into the soil and water, contaminating the food chain and posing a risk to human health and threatens the long-term sustainability of our planet. It is therefore essential to reduce plastic waste and promote sustainable practices to address this issue.

Today, it is estimated that around 8 million tons of plastic end up in the ocean each year, with devastating consequences for marine life and ecosystems. A study conducted in 2022 by the Department of Civil Engineering at Chittagong University of Engineering and Technology (CUET) indicated that Chittagong, alone produces 249 tonnes of plastic waste every day, and this could rise to 428 tonnes per day by 2052. Another study revealed that Dhaka collects 646 tonnes of plastic waste daily, but only 37.2% of this waste is recycled, while the rest ends up in various places like landfills, water bodies, playgrounds, roads, and sea beaches and posing health risks to animals and humans that come into contact with it.

However, there are sustainable alternatives to plastic wrap that can help reduce plastic waste, such as beeswax wraps. In this article, we will explore the potential of beeswax wraps as a way to reduce plastic waste, including their benefits, drawbacks, and how they can be used as part of a sustainable lifestyle.

There are several ways to reduce plastic waste. Using reusable bags instead of single-use plastic bags, carrying reusable water bottle, container, avoiding the consumption of plastic straws and utensils, using cloth or reusable bags instead of plastic bags for grocery shopping, reducing the use of plastic wrap and use alternatives like beeswax wrap, proper disposal of plastic waste in designated recycling bins and many more.

Beeswax wrap is a reusable and eco-friendly alternative to plastic wrap for food storage. It is made by infusing cotton fabric with a mixture of beeswax, tree resin, and jojoba oil. The beeswax in the mixture makes the fabric sticky, so it can be moulded around food and containers. Beeswax wrap is a great alternative to plastic wrap because it is reusable, biodegradable, and compostable. It can

*Associate Professor, Faculty of Business Administration, Eastern University

be used to wrap sandwiches, cheese, fruits, vegetables, and other food items. It is also breathable, which means it can keep food fresh for a longer time than plastic wrap, as it allows air to circulate.

To use beeswax wrap, we need to warm it with our hands to make it bendable, then wrap it around the food or container. It will stick to itself and create a seal that keeps your food fresh. After use, it can be washed in cool water and reused. With proper care, beeswax wraps can last up to a year.

The primary source of beeswax wrap is beeswax, which is obtained from bees. Beeswax is a natural wax produced by honeybees and is commonly used in a variety of products, including candles, lip balms, and skincare products. Apart from beeswax, the other ingredients used in beeswax wraps are also natural. Tree resin is typically obtained from pine trees and is used to give the wrap its sticky texture. Jojoba oil is derived from the jojoba plant and is added to the mixture to keep the wrap pliable. The fabric used to make beeswax wraps can vary, but it is typically made of natural fibres like cotton, hemp, or linen. The fabric is usually unbleached and undyed to ensure that the wrap is free from harmful chemicals.

Beeswax wraps are gaining popularity as a sustainable alternative to plastic wrap in many countries around the world. United States, Canada, Australia, United Kingdom, New Zealand, Germany, France are some of the countries that are producing and using beewax wraps. Though, some shops have started to sell beewax wrap, but public awareness regarding beewax wrap is not notable.

Using beeswax wrap in Bangladesh can have several benefits, some of which are:

1. Eco-friendly: Beeswax wraps are made from natural materials, such as cotton fabric and beeswax, which are biodegradable and compostable. Beeswax wraps reduces environmental impact and contributes to a more sustainable future.

2. Reusable: Beeswax wraps can be reused multiple times, unlike single-use plastic wrap, which is discarded after a single use. By using beeswax wraps the amount of waste generated from food packaging can be reduced.

3. Cost-effective: While beeswax wraps may seem expensive at first, they are actually cost-effective in the long run. They can be used for up to a year with proper care and investing money on disposable plastic wrap can be saved.

4. Keeps food fresh: Beeswax wraps are breathable and can keep food fresh for longer than plastic wrap, as they allow air to circulate. This can help to reduce food waste and save money on groceries.

5. Supports local industry: In Bangladesh, beeswax wraps can be made by local artisans, supporting the local economy and creating jobs.

There are some potential drawbacks or dark sides of beewax wraps that need to consider before going for it.

1. Limited Use: Beeswax wraps are not recommended for storing meat or other protein-containing products, as they can harbour bacteria and promote spoilage. They are also not suitable for use in the microwave or oven.
2. Maintenance: Beeswax wraps require maintenance and regular cleaning to keep them in good condition. Over time, they can become stained, lose their stickiness, or develop tears or holes.
3. Cost: Beeswax wraps can be more expensive than traditional plastic wrap, which may not be affordable for some people.
4. Availability: Beeswax wraps may not be widely available in all areas, which can make them difficult to access for some people.
5. Beeswax Sourcing: There are concerns about the ethical sourcing of beeswax, particularly from commercial beekeeping operations that may prioritize profit over the welfare of bees.
6. Wax Ingredients: The ingredients used to make the wax mixture in beeswax wraps can vary, and some people may have allergies or sensitivities to the components.

The cost of producing and marketing beeswax wraps can vary depending on several factors, such as the size and type of wrap, the source and quality of the ingredients, and the scale of production. In general, the cost of producing a single beeswax wrap can range from tk.100 to tk.500, depending on the size and quality of the fabric and the amount of wax, resin, and oil used to make the wrap. The cost may be higher if the fabric is organic or sustainably sourced.

The cost of marketing beeswax wraps can also vary depending on the marketing channels used. For example, marketing through social media or an e-commerce website may have lower costs than marketing through traditional retail channels. To reach consumers, beeswax wraps can be sold online, in local markets, or through retail stores. The price of a single beeswax wrap can range from tk.500 to tk.1500, depending on the size and quality of the wrap, and the location and target market.

Overall, producing and marketing beeswax wraps can be a profitable business, especially if the wraps are marketed as a premium, eco-friendly, and sustainable product. However, it is essential to consider the costs of production, marketing, and distribution, as well as the competition in the market, to ensure profitability.

In conclusion, beeswax wrap has the potential to be an effective way to reduce plastic waste in Bangladesh. With a high demand for sustainable alternatives to single-use plastics, beeswax wraps offer a reusable and eco-friendly alternative that can help reduce plastic pollution. While there may be challenges in producing and marketing beeswax wraps in Bangladesh, the benefits of using them, such as reducing plastic waste, promoting sustainability, and supporting local communities, make it a promising option. By raising awareness about the benefits of beeswax wraps and promoting their use, we can all play a role in reducing plastic pollution in Bangladesh and promoting a more sustainable future for our planet.

The Impact of Plastic Pollution on Bangladesh and its Possible Solution

Md. Alim Miah*

Introduction

Plastic pollution is a major issue globally, and Bangladesh is no exception. The country faces significant challenges in managing its plastic waste, which has far-reaching impacts on the environment, public health, and the economy. Plastic pollution is a growing problem that affects the environment, health, and economy of many countries. Bangladesh, a densely populated country in South Asia, is one of the worst affected by plastic pollution. Plastic waste is a ubiquitous sight in the country, from streets to rivers to beaches. It is not only an eyesore but also a threat to the country's ecosystem and public health.

Plastic pollution is a topic of interest that has recently gained momentum in Bangladesh. Although each municipal government in Bangladesh is ultimately in charge of overseeing waste collection and management, the informal sector collects much of the waste (UN, 2010). Incidentally, attempts made to separate plastic waste for recycling purposes are mostly conducted by the informal sector in Bangladesh.

General facts regarding plastic

The usage of plastic rose after the 1950s, when its projected worldwide output was at 2 Mt. By 2019, it had climbed to 460 Mt, and by 2030, it is anticipated to reach 590 Mt (Geyer, 2020; OECD, 2022). On the other hand, the amount of plastic garbage generated globally has increased from 156 Mt in 2000 to 342 Mt in 2019 (OECD, 2022). In all, just 9% of plastic is recycled, while 22% of it is misused (OECD, 2022). The amount of plastic used for packaging increased globally between 2011 and 2019 from around 112 Mt to roughly 143 Mt (OECD, 2022).

After architecture and construction, electronics, textiles, and consumer goods, plastic is the material that is most frequently used in packaging (OECD, 2022). The typical lifespan of polymers used in the packaging business is less than a year due to the single-use nature of plastic packaging. Contrarily, plastics used in construction and building, including polyvinyl chloride (PVC), have a 35-year shelf life. Plastic also has a lifespan of 20 years, 13 years, 8 years, 5 years, and 3 years, respectively, when used in industrial machinery, transportation, electronics, textiles, and consumer items (Rhodes, 2018).

*Assistant Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

In essence, plastics are artificial synthetic polymers that are derived from petrochemicals or crude oils. Compared to many other readily available natural materials, plastic is lighter, more pliable, and more durable. Plastic has a wide range of uses since it seldom interacts with other substances, including packaging for food and culinary products (Abbing,2020). Because they are hydrophobic, plastics do not break down or degrade. Polyethene, which gained popularity after the 1960s and is a significant contributor to global plastic waste, is used to make the majority of packaging and single-use plastic bags (Abbing, 2020).

Thermoplastics and thermosets are the two basic categories for plastics. Thermoplastics are types of plastic that can be heated up, remelted, and then reshaped, making them perfect for recycling. Polyethene (PE), polypropylene (PP), PVC, polyethene terephthalate (PET), polystyrene (PS), and polyamide (PA) are a few examples of thermoplastics.

Plastic waste Management in Dhaka

Dhaka, the capital city of Bangladesh, is facing a serious plastic waste management problem due to its large population and inadequate waste management infrastructure. However, there are several initiatives that can be taken to manage plastic waste in Dhaka. In Bangladesh, the informal sector plays a substantial role in the plastic recycling system. More than 1 million informal waste collectors work around the clock to keep the city streets clean. (ESDO, 2020). Additionally, waste is also collected by individuals employed by the city corporation. The informal sector, however, recycles the majority of plastic waste. During this process, they collect different types of mixed waste from households or urban streets and segregate the plastic waste which can be sold to small recycling shops (Figure 1). At times door-to-door waste collectors also collect waste from households and dispose of it directly in secondary collection points, after which representatives from the city corporations transport the mixed waste to the designated landfill. Informal waste collectors then procure valuable plastics from the landfill or secondary collection points which they later sell to small local wholesale or recycling shops. These are later sold to other firms from the recycling industry where they convert the plastic into pellets. These pellets are then used as raw materials for manufacturers to produce plastic products to be sold to consumers (The World Bank, 2021). The management of plastic waste in Dhaka requires a comprehensive approach that involves the government, NGOs, local businesses, and citizens. Through collaboration and innovation, it is possible to reduce the amount of plastic waste and create a cleaner and healthier city for all.

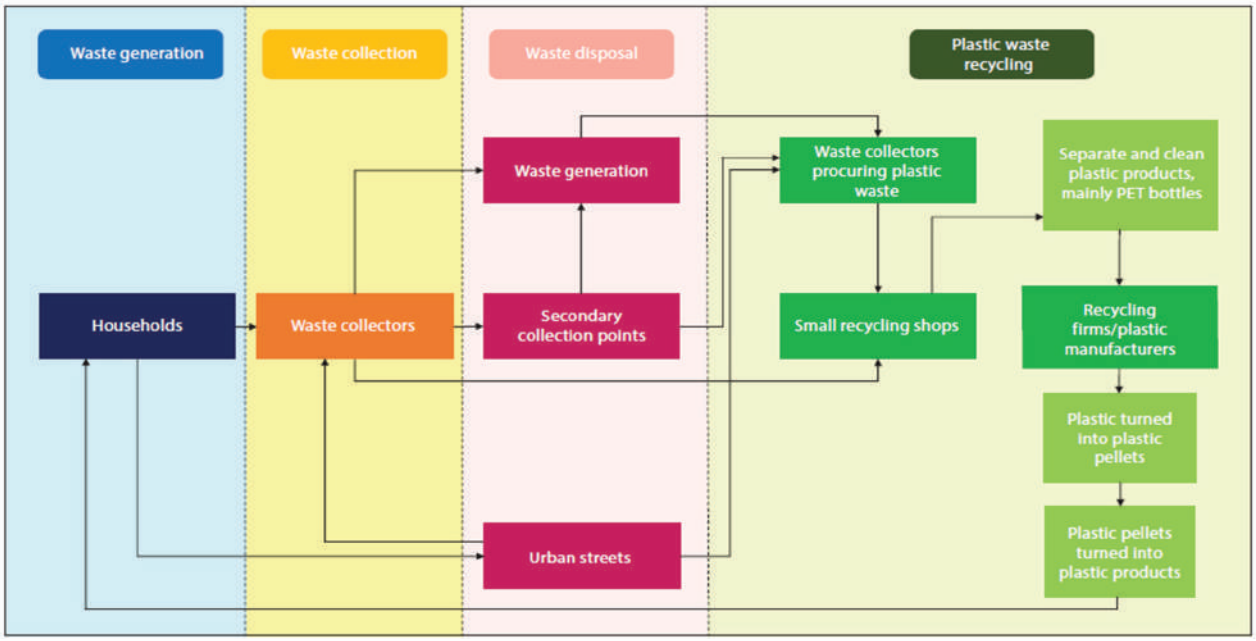

Figure 1: Waste Management and Plastic Recycling System in Dhaka (Source: Khatun et al., 2023)

Causes of plastic pollution in Bangladesh

There are several reasons for the high levels of plastic pollution in Bangladesh. Firstly, the country has a large population, with over 160 million people, and a significant proportion of them use plastic products. Secondly, there is a lack of awareness and education on the harmful effects of plastic pollution, and people often do not understand the consequences of their actions. Thirdly, there is limited infrastructure and resources for waste management, and many people resort to littering or burning plastic waste.

Effects of plastic pollution in Bangladesh

Environmental impact

The environmental impact of plastic pollution in Bangladesh is significant. Plastic waste mismanagement contributes to water pollution, air pollution, as well as soil pollution to some extent. The country's rivers and water bodies are choked with plastic waste, which affects the aquatic ecosystem. Plastic waste contaminates the water, making it hazardous for marine life and humans. The polluted water also affects the quality of the soil, leading to reduced crop yields and food insecurity. Air pollution is also a significant consequence of plastic waste. When plastic is burned, it releases toxic chemicals into the air, which is harmful to human health. The open burning of plastic waste is a common practice in Bangladesh, contributing to the country's poor air quality. A significant amount of plastic waste is indiscriminately thrown away on the side of streets. Incineration of plastic generates toxic and harmful gases such as hydrogen chloride, hydrocyanic acid, carbon monoxide, carbon dioxide, and other noxious pollutants (Hossain, Rahman, Chowdhury, & Mohonta, 2021).

Health impact

The health impact of plastic pollution in Bangladesh is severe. The exposure to toxic chemicals released from burning plastic waste can cause respiratory problems, cancer, and other health issues. The plastic waste also provides a breeding ground for mosquitoes, increasing the risk of malaria, dengue fever, and other vector-borne diseases. The use of plastic bags in the food industry is also a concern for public health. Plastic bags are not biodegradable and can contaminate food, leading to food poisoning and other illnesses.

Economic impact

The economic impact of plastic pollution in Bangladesh is also significant. The country's tourism industry is affected by the plastic waste on the beaches, which discourages visitors. The fishing industry is also impacted by plastic pollution, as it affects the quality and quantity of fish caught. This, in turn, affects the livelihoods of those who depend on fishing for their income.

Solutions to plastic pollution in Bangladesh

There is no single solution to plastic pollution in Bangladesh. However, a combination of different strategies can be employed to tackle this problem.

Regulations and policies

Regulations and policies can be put in place to restrict the production, importation, and use of single-use plastics. Bangladesh has already banned the use of polythene bags, but more needs to be done to enforce this ban. The government can also provide incentives to companies that use eco-friendly alternatives to plastic.

Waste management

Proper waste management is critical in addressing plastic pollution in Bangladesh. The government can invest in waste management facilities to collect, recycle, and dispose of plastic waste properly. This can be done through public-private partnerships, where the government provides incentives to private companies to invest in waste management.

Education and awareness

Education and awareness campaigns can be effective in reducing plastic pollution. The government can launch public awareness campaigns to educate people on the dangers of plastic pollution and the importance of waste reduction. The campaigns can be done through the media, schools, and community groups.

Individual action

Individual action is crucial in reducing plastic pollution. Consumers can reduce their plastic footprint by using reusable bags, bottles, and containers. They can also avoid single-use plastics such as straws, cutlery, and packaging. Companies can also play a role in reducing plastic pollution by using eco-friendly alternatives to plastic and reducing their packaging.

Recycling facilities: The establishment of recycling facilities can help to reduce the amount of plastic waste in the city. The government can provide incentives to private companies to invest in recycling plants.

Plastic bag ban: The use of plastic bags can be banned, and alternatives such as reusable cloth bags or paper bags can be promoted. The government can work with local businesses to implement this ban effectively.

Waste collection and segregation: Improving the waste collection and segregation system can help to manage plastic waste more effectively.

Plastic waste reuse: There are several innovative ways to reuse plastic waste, such as using plastic bottles to make eco-bricks, using plastic bags to make products such as floor mats, and using plastic cups and plates to make art installations. NGOs and local businesses can work together to promote such initiatives.

Composting: Organic waste can be composted, which can reduce the amount of waste going to landfills and provide a source of organic fertilizer. The government can encourage citizens to compost their organic waste at home and provide composting facilities in public areas.

Conclusion

Plastic pollution is a growing problem in Bangladesh, with significant environmental, health, and economic consequences. The country needs to take urgent action to address this issue. The solutions to plastic pollution in Bangladesh require a concerted effort from the government, private sector, and individuals. To beat plastic pollution, individuals, businesses, and governments need to work together to reduce the amount of plastic waste that is produced and to increase recycling and reuse.

References

1. Abbing, M. R. (2020). Plastic Soup: An Atlas of Ocean Pollution. Island Press.
2. ESDO. (2020). Environment and Social Development Organization- ESDO. Retrieved August 6, 2022.
3. Geyer, R. (2020). A Brief History of Plastics. In mare plasticum- the plastic sea: Combatting Plastic Pollution Through Science and Art (pp. 31-47). Springer. Retrieved July 26, 2022.
4. Hossain, S., Rahman, M. A., Chowdhury, M. A., & Mohonta, S. K. (2021). Plastic pollution in Bangladesh: A review on status emphasizing the impacts on environment and public health. Environmental Engineering Research, 26(6).
5. Khatun, F., Saadat, S. Y., and Mahbub, A., (2023). Plastic Pollution in Bangladesh: Drivers, Impacts, and Solutions. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).
6. OECD. (2022). Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options. Organization for Economic Co-operation and Development. Retrieved July 26, 2022, from https://doi.org/10.1787/de747aef-en.
7. The World Bank. (2021). Towards a multisectoral action plan for sustainable plastic management in Bangladesh. The World Bank. Retrieved July 30, 2022.
8. UN. (2010). Solid waste management in the world cities and water sanitation in the world's cities. Washington DC: UN-HABITAT. Retrieved July 28, 2022.

Soil Salinity and its Impacts on Crop Agriculture in the Coastal Areas of Bangladesh: A Comprehensive Analytical Review

Umme Salma Sumi*
Md. Harun Or Rashid**

Abstract

Soil salinity poses a significant environmental challenge, limiting agricultural crop productivity worldwide. But climate change-induced salinity intrusion is worsening the situation manifolds which needs the government's more attention and more initiatives. This write-up elucidates the ongoing early warnings related to climate change, indicating its awful impacts in the near future, specifically focusing on the emerging challenges from salinity intrusion in the coastal belt of Bangladesh, its adverse effects on soil fertility, crop yields, and the ultimate impacts on the food security and the environment. Being a climate-vulnerable country due to its low-lying geography, salinity-related issues become crucial for the densely populated country: Bangladesh's food security. As the world is going through extreme climate change forecasts which will bring drastic effects on food production, it needs to emphasize on to explore opportunities for enhancing food production in the coastal lands. Consequently, with the highest consideration for the development of agriculture and the welfare of the farmers, the government is continuing its all-out efforts for the overall development of the agricultural sector in light of Vision 2041, the 8th Five-Year Plan, and other planning documents. Moreover, the recommendations of this article will help the initiatives the government to take appropriate actions for addressing soil salinity and its adverse impacts on crop production in order to guarantee food security in the context of the aggravated climate.

Introduction

Bangladesh, a low-lying country in the head of the Bay of Bengal, is highly vulnerable to climate change. It ranks 7th among the most affected countries due to climate change, according to the Global Climate Risk Index 2021 (Germanwatch, 2021). Rising sea levels, tidal inundation, erosion, and saltwater intrusion pose significant risks to the already vulnerable coastal population. These factors lead to adverse hydrological conditions and restrict normal crop production throughout the year. About 53% of the coastal areas of Bangladesh are affected by salinity and this situation will be aggravated in the near future due to sea-level rise (S.A. Haque, 2006). Therefore, addressing the impact of soil salinity has become a major concern for the Government of Bangladesh, which is implementing various adaptation activities to lessen the effects of climate change on agriculture.

The IPCC Sixth Assessment Report and the Coastal Areas of Bangladesh

The IPCC Sixth Assessment Report (AR6) highlights Bangladesh's vulnerabilities due to sea-level rise. These include increased salinity in shallow groundwater, contamination of coastal aquifers,

*Assistant Director, Department of Environment
**Deputy Director, Department of Environment

and constraints on sustainable groundwater supplies. Additionally, the report predicts a decrease in freshwater river areas and warns of increased floods, droughts, and salinity intrusions, leading to crop destruction and both economic and non-economic losses (AR6, 2022). According to the AR6 Report, Bangladesh faces the following vulnerabilities due to sea-level rise:

- Almost 26 million people are currently exposed to very high salinity in shallow groundwater in coastal Bangladesh.
- Many low-lying coastal aquifers are contaminated with increased salinity due to land-use change, rising sea levels, reduced stream flows, and increased storm surge inundation.
- Indo-Gangetic Basin reveals that sustainable groundwater supplies are constrained more by extensive contamination (e.g., arsenic, salinity) than depletion.
- Between 2012 and 2050, the freshwater river area is expected to decrease from 40.8% to 17.1% in the southwest coastal zone of Bangladesh.

Soil Salinity in the Coastal Area

Soil salinity is a significant threat to agriculture and livelihood, particularly in the Southern coastal areas of Bangladesh. Soil salinity is extended from 0.833 to 1.056 million hectares (about), with an increase of 26% between 1973 and 2009. Out of about 1.689 million hectares of coastal land, about 1.056 million hectares (i.e., 62.52%) are affected by soil salinity of various degrees covering 49 Upazila (sub-district) of 19 coastal districts. About 0.328, 0.274, 0.189, 0.161, and 0.101 million hectares of land are affected by very slight (S1), slight (S2), moderate (S3), strong (S4), and very strong salinity (S5), respectively. Data recorded by SRDI manifests new ingression of salinity in Narail, Jashore, Barishal, Gopalgonj, Jhalakati, and Madaripur districts. Soil salinity also encroached on a large area of Bhola, Patuakhali, Khulna, and Bagerhat, besides minor ingress in other districts. The salinity level is almost double (2.8-18.5 to 4.0-42.8 dS/m) from 1973 to 2009 in Sharankhola Upazila of Bagerhat district, Dumuria Upazila of Khulna district and Shyamnagar Upazila of Satkhira district (SRDI, 2010; Shawkhatuzamman et al., 2023).

Different causes are involved in increasing the water and soil salinity of the coastal area of Bangladesh, like the withdrawal of fresh river water from upstream, irregular rainfall, faulty management of sluice gates and polders, regular tidal water flooding in an unprotected area, the capillary rise of soluble salts, decreased surface water availability, lowered ground water table, and reduced soil moisture content, the introduction of unplanned shrimp cultivation, lack of drainage facilities. Beyond everything, frequent storm surges and sea level rise are the main reasons for the expansion of saline areas at an increasing rate. According to the IPCC's Sixth Assessment Report, the average rate of sea level rise increased to 3.7 mm/year between 2006 and 2018 and this rate is further increasing day by day due to global warming-induced swelling of the ocean and rapid melting of polar ice caps resulting in coastal low-lying countries like Bangladesh are in danger.

The Department of Environment is implementing a research study titled "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water, and Infrastructure) Impacts" funded by the Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF). Findings from the study show that in the last 30 years, the sea level in the coastal areas of Bangladesh has been increasing at an annual rate of about 3.8-5.6 mm. The study also illustrates that about 12.34%-17.95% of the coastal area (an area larger than many small island countries) will be submerged due to sea-level rise by this century. In this study, salinity in surface water has been assessed for different SLR scenarios RCP 4.5 (Medium), RCP 4.5 (Extreme), RCP 8.5 (Medium), and RCP 8.5 (Extreme). The results are analyzed and presented as isohaline lines of several salinity levels. The base condition for the comparison of salinity is the 2011 situation, as calibrated and validated by the salinity model. The salinity maps for these scenarios are presented in Figures 1 to 4. The simulation results reveal that the higher the SLR augments, the higher the salinity ingress in the coastal areas. This will affect mostly the south-central region heavily and reduce this region's agricultural productivity.

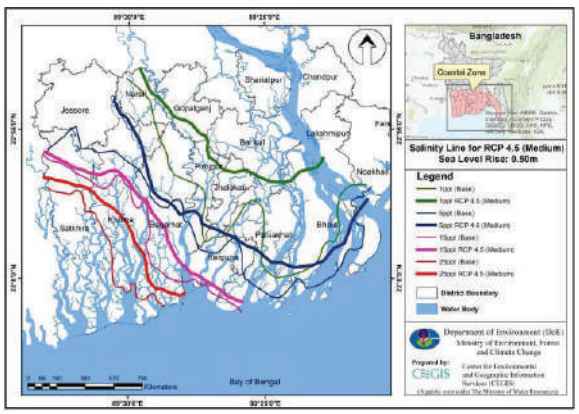

Figure 1: Salinity Map for RCP 4.5 (Medium) SLR Scenario

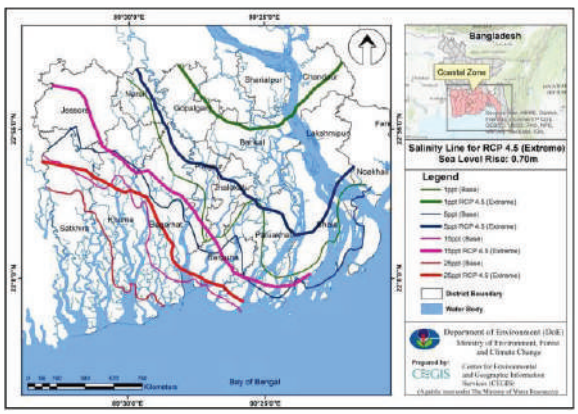

Figure 2: Salinity Map for RCP 4.5 (Extreme) SLR Scenario

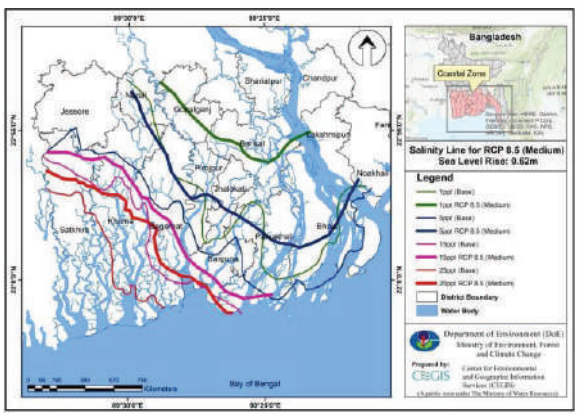

Figure 3: Salinity Map for RCP 8.5 (Medium) SLR Scenario

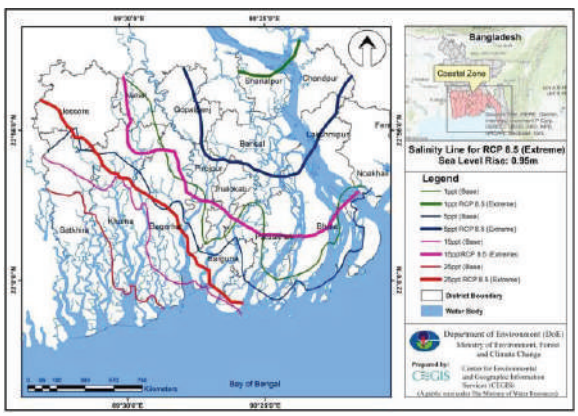

Figure 4: Salinity Map for RCP 8.5 (Extreme) SLR Scenario

Source: DoE, 2023 (Draft)

From the above figures, it is revealed that even Shariatpur, Madaripur, and Gopalganj regions situated in the middle part of the country can be affected by salinity intrusions due to sea level rise under the extreme SLR scenario.

Adverse Impacts of Salinity on Crop Production

Salinity causes a hostile environment for normal crop production throughout the year in the coastal belt of Bangladesh. High soil pH (6.0-8.4) induces a deficiency of micronutrients in the soils of the southwest coastal region of Bangladesh (S.A. Haque, 2006). The organic matter content of the coastal soils is pretty low (1.0–1.5%). Nutrient deficiencies of N and P are quite common in saline soils. High Ca and K contents in these soils are responsible for the deterioration of soil physical properties, followed by offset plant nutrition. Moreover, phenomena like synergism derived from high Mg content induced Na uptake encompassing antagonism with a simultaneous reduction in Ca and K uptake also occur. Along with notable P deficiencies, these soils are even deficient in Zn and Cu too (Karim et al., 1990).

Salinity creates an unfavorable environment for crop production throughout the year in the coastal belt of Bangladesh. It induces nutrient deficiencies and deterioration of soil physical properties and reduces plant growth, development, and yield. Thus saline-prone coastal regions had a drastic yield loss, i.e., approximately an average of 20-40% in major crops (cereals, potatoes, pulses, oil seeds, vegetables, species, and fruit crops). The dominant cropping pattern of the saline-prone areas of coastal Bangladesh is locally transplanted Aman followed by HYV Boro rice. Further rice-based farming systems are being converted into prawn/shrimp/crab-based farming due to salinity accompanied by the disappearance of native fish species both in open and freshwater bodies encompassing decreased livestock production leading to food insecurity (Miah et al., 2020).

Bangladesh's Initiatives for Addressing Coastal Soil Salinity and Its Impacts on Crop Production

Due to climate change, the gradual extension of salinity intrusion in the coastal area of Bangladesh is very threatening to agricultural crop production, the livelihood of farmers, and broadly the food security of the country. On the contrary, several official policy documents, including Sustainable Development Goals, Deltaplan-2100, the 8th Five Year Plan, Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041, National Agriculture Policy 2018, and National Agricultural Extension Policy 2020 explicitly state the goals to achieve universal food security in the country. Therefore, managing soil salinity is crucial for Bangladesh to achieve the target of universal food security in the country. In this regard, the government has undertaken research on the development of salt-tolerant crop varieties to cope with the changing climate. Some high salt-tolerant crop varieties, already developed by different agencies, are BRRI dhan 23, 40, 41, 55, 67, 73 (8 ds/m); BRRI dhan 47 (8-12 ds/m), 97(8-14 ds/m), 99 (8-10 ds/m); BINA dhan8, 10,23. Besides, the government is implementing several projects on the construction of dams and sluices, embankments, and zoning of coastal areas. Moreover, the government has also paid attention to plantation and public awareness programs, and to the distribution of essential fertilizers among farmers to improve the fertility of the soil.

Furthermore, the country has formulated the National Adaptation Plan (NAP) 2023-2050 focusing on protection against climate change, developing climate-resilient agriculture, promoting climate-

smart cities, and implementing nature-based solutions. The following interventions are included in the NAP to address the salinity problem in the coastal belt of Bangladesh, which are expected to be implemented in the near future.

- Integrated management of coastal polders, sea dikes, and cyclone shelters against tropical cyclones, sea-level rise, and storm surges.
- Management of freshwater resources and monitoring of salinity for reducing vulnerabilities in existing and potential salinity-prone areas.
- Protection and management of potentially vulnerable areas due to tropical cyclones, sea-level rise, extreme storm surges, and flooding.
- Extension of climate-smart technologies for increasing irrigation water use efficiency
- Augmentation of surface water for irrigation and multipurpose use.
- Extension of stress-tolerant, pest- and disease-resistant rice and non-rice crops.
- Increased fertilizer use efficiency for enhancing production.
- Extension and expansion of the coastal greenbelt for protecting coastal habitats, including the Sundarbans, mangroves, salt marshes, etc.

Additionally, several other policy documents like Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP), and Delta Plan-2100 also emphasize addressing salinity problems, integrated management of coastal areas, freshwater resource management, stress-tolerant crop extension, and coastal greenbelt expansion.

Conclusion and Recommendation

According to the latest AR6 report and the UNFCCC NDC Synthesis Report 2022, currently, the global temperature increase is heading to 3.7°C. Assuming full implementation of the latest Nationally Determined Contributions (NDCs), the temperature will still increase to around 2.4°C by 2100 (AR6, 2022; UNFCCC, 2022). Even, World Meteorological Organization (WMO) is sounding the alarm that the annual average near-surface global temperature between 2023 and 2027 will be more than 1.5°C above pre-industrial levels for at least one year (WMO, 2023). Hence, the increasing global temperatures are leading to more ocean heating and acidification, sea ice and glacier melt, sea level rise, and more extreme weather. As a result, the global mean sea level may rise by one meter or more in the twenty-first century while it was 0.2 meters between 1901 and 2018 (Dasgupta et al., 2009; Vermeer and Rahmstorf, 2009; Brecht et al., 2012; WMO, 2023). Consequently, about 600 million people currently inhabiting low-elevation coastal zones will be affected by increasing salinization which will decline soil fertility further and crop production; thus, affecting food security in the future (Wheeler, 2011).

The coastal belt of Bangladesh covers more than 30% of the cultivable lands remaining at extreme risk due to salinity intrusion. Therefore, the projected increase in climate change-induced salinity intrusion and its drastic impact on agriculture became an important concern for the government of Bangladesh. So, these ongoing early warnings of extreme situations demand extensive initiative to protect people, their livelihood, and biodiversity. The government has already developed a number of saline-tolerant crop varieties; however, research (Shawkhatuzamman et al., 2023) shows that salinity intrusion has already doubled, even increased to 42.8 dS/m in some areas. So, more research should be conducted to develop high salt-tolerant crop varieties and to identify methods to flash out the topsoil salinity with good quality water after ploughing, thereby reducing the negative impact on brackish water aquaculture, germination, and crop seedling. Besides, effective collaboration with the upper riparian country to enhance upstream flows of river water during the dry season will be fruitful to reduce the intrusion of saline water. Furthermore, initiatives could be undertaken to reserve surface water in canals, ponds, and other water bodies during the rainy season to minimize the shortage of fresh water in the coastal region. During the construction of polders, dams, and embankments, attention should be given to climate change scenarios including increased frequency and intensity of tidal surges so that the constructed polders, dams, and embankments would be able to provide more effective protection from storm surges and salinity intrusion. However, Bangladesh being an innocent victim of climate change needs more international financial and technological support to address soil salinity, promote sustainable agriculture, and secure food supplies for the future.

References

[1] Brecht, H., Dasgupta, S., Laplante, B., Murray, S., and Wheeler, D. (2012). Sea-level rise and storm surges: High stakes for a small number of developing countries. The Journal of Environment & Development 21: 120–138.

[2] Dasgupta, S., Laplante, B., Meisner, C., Wheeler, D., and Yan, J. (2009). The impact of sea level rise on developing countries: A comparative analysis. Climatic Change 93(3–4): 379–388.

[3] Eckstein, D., Kunzel, V., and Schafer, L. (2021). Global Climate Risk Index 2021. Published by Germanwatch. Available at https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

[4] Haque, S.A. Salinity problem and crop production in Coastal regions of Bangladesh, Pakistan Journal of Botany, 38(5), 1359-1365, 2006.

[5] The IPCC Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. (2022). Available at https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

[6] The IPCC Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. (2022). Available at https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

[7] Karim, Z., Hussain, S. G., & Ahmed, M. (1990). Salinity Problems and Crop Intensification in the Coastal Regions of Bangladesh (Soils Publication No. 33, pp. 1-20). Dhaka: Bangladesh Agricultural Research Council (BARC).

[8] Miah, M.Y., Kamal, M.Z.U., Salam, M.A., and Islam, M.S. (2020). Impact of salinity intrusion on Agriculture of Southwest Bangladesh. International Journal of Agricultural Policy and Research Vol.8 (2), pp. 40-47. Available at https://doi.org/10.15739/IJAPR.20.005.

[9] Shawkhatuzamman, M., Roy, S.R., Alam, M.Z., Majumder, P., Anka, N.J., and Hasan, A.K. (2023). Soil Salinity Management Practices in Coastal Area of Bangladesh: A Review. Res. Agric. Livest. Fish. 10(1): 1-7. Available at https://doi.org/10.3329/ralf.v10i1.66211

[10] Soil Resources Development Institute (SRDI). (2010). Saline Soils of Bangladesh; SRDI, Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh.

[11] Soil Resources Development Institute (SRDI). (2001). Soil Resources in Bangladesh: Assessment and Utilization; SRDI, Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh.

[12] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2022). 2022 NDC Synthesis Report. Available at https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022

[13] Vermeer, M., and Rahmstorf, S. (2009). Global sea level linked to global temperature. Proceedings of the National Academy of Sciences 106(51): 21527–21532.

[14] Wheeler, D. (2011). Quantifying vulnerability to climate change: Implications for adaptation assistance. Washington: Center for Global Development Working Paper No. 240.

[15] World Meteorological Organization (WMO). (2023). Global temperatures set to reach new records in next five years. Available at

https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-temperatures-set-reach-new-records-next-five-years?fbclid=IwAR2ReoPeUepAAuDN6X1sTWLVzeZEa7eQncFdav2NhBaQeQXMp-Ea5e3udhs

International and Bangladesh Perspective of Electronic Waste Management: Some Solution Proposals

Sabbir Ahammed ; Md. Al- Amin Hossen; Md.Raduanul Islam; Md. Mehedi Hassan; Nasim Reza Hridoy; Shahrier Hossain; Navid Mahfuz Nayeem; Md. Shohaibur Rahman; Rifat Hossain; Sudipto Roy Pritom; Dr. Md. Kabiruzzaman*

Introduction:

Electronic waste or e-waste is discarded electronic devices or equipment, which are no longer usable or broken. This includes but is not limited to, televisions, computers, smartphones, and other electronic devices. Metallic materials, silicon dioxide, polyester-based materials, phenol, formaldehyde, halogenated polymers, N-containing polymers, and other hazards have been identified in e-waste. 60.2% of e-waste is composed of various metals, such as Fe, Au, Pb, Hg, Cr, Cu, and Cd; 15.2% plastic components, 5% metal-plastic composites, and 12% tubes and screens [1]. Improper management of e-waste can cause environmental pollution and public health hazards. Hence, proper management of e-waste following ethical engineering practices is crucial. This article aims to explore e-waste management practices internationally and also from Bangladesh's perspective, as well as discuss how management practices can be done.

Fig-01: E-waste.

E-wasteManagementInternationally:

E-waste management is a significant concern worldwide and global e-waste generation was approximately 53.6 million metric tons (MMT) in 2019, and this number is projected to increase to 74.7 MMT by 2030[1]. Many countries have enacted rules and policies to ensure the proper disposal of e-waste. In the field, the European Union established the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, which allows manufacturers to ensure the safe disposal of their electronic products [2]. Additionally, in the United States, the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), regulates the disposal of hazardous waste, including e-waste. The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, signed in 1989, is the first international convention aimed at managing hazardous waste, including e-waste. This convention establishes a set of guidelines for the transboundary movement of hazardous waste, including e-waste [3]. Nevertheless, in 2009, the Basel Ban Amendment Convention was introduced to ban the importation of hazardous waste from developed or developing countries to other countries. One of the most effective ways to manage e-waste internationally is through recycling.

*Faculty of Engineering, American International University-Bangladesh

Recycling can recover valuable materials from e-waste, reduce the need for new resource extraction, and mitigate the negative environmental impacts of improper disposal. Several countries have implemented e-waste recycling programs to manage e-waste effectively. For example, Japan has implemented legislation promoting recycling small waste electrical and electronic equipment, which requires manufacturers to establish a recycling system for their products [4].

Fig-02: An Initiative for E-Waste Recycling.

E-waste Management in Bangladesh:
Bangladesh has become one of the largest importers of e-waste in South Asia, with a significant amount of e-waste being illegally imported. Moreover, Bangladesh generates 3 MMT of e-waste every year and GOB's 'Digital Bangladesh' initiative and the current availability of technology in Bangladesh will increase the use of e-products in the coming years. In Dhaka, 475 t/day of inorganic e-waste is recycled, which is only 15% of the total e-waste generation/day. Due to improper disposal methods, recycled waste has an impact on the environment. Throughout Bangladesh, unplanned disposal of e-waste including lead (Pb), mercury (Hg), chromium (Cr), and cadmium (Cd) poses significant health and environmental hazards. The e-waste management system in Bangladesh is inadequate, with a lack of proper regulations and policies in place.This has led to the informal sector becoming the country's primary method of e-waste management [1].

The informal sector involves collecting e-waste from households and businesses and dismantling them in small workshops. The workers in these workshops are often untrained and lack the necessary protective gear, exposing them to hazardous materials. The e-waste components are sold in local markets or exported, leading to environmental pollution and health hazards. In 2011, the Bangladesh Electronic Manufacturers and Importers Association (BEMIA) proposed a draft guideline on e-waste management. The guideline aims to promote the responsible management of e-waste and suggests a framework for the collection, transportation, and disposal of e-waste. To address the e-waste management issue in Bangladesh, the government enacted the Hazardous (E-waste) Management and Handling Rules in 2018. The rules mandate the establishment of e-waste collection centers, recycling facilities, and the safe disposal of hazardous e-waste. However, the implementation of the rules has been slow, and the informal sector continues to be the primary method of e-waste management [5].

Solution proposals for E-waste management in Bangladesh:
E-waste, or electronic waste, is a growing environmental and health concern in Bangladesh, as the country experiences rapid urbanization and industrialization. To effectively manage e-waste in Bangladesh, the following solution proposals can be considered:

1. Establishing Proper E-waste Collection and Recycling Facilities: The government and relevant stakeholders should establish designated e-waste collection centers in major cities and towns to ensure proper collection and disposal of e-waste. These centers should be equipped with appropriate facilities for safe recycling and disposal of e-waste, following internationally recognized environmental and health standards.
2. Raising Awareness and Educating the Public: Raising awareness about the hazards of improper e-waste disposal and promoting responsible e-waste management practices among the public, including individuals, businesses, and industries, is crucial. Educational campaigns, workshops, and training programs can be conducted to inform people about the importance of recycling e-waste and the proper methods for disposal.

Fig-03: E-waste Collection and Recycling[6].

3. Implementing E-waste Regulations and Policies: The government should establish and enforce stringent regulations and policies related to e-waste management. This includes proper licensing and certification for e-waste recyclers, importers, and exporters and imposing penalties for illegal e-waste dumping or improper handling.
4. Encouraging Extended Producer Responsibility (EPR): Implementing EPR policies would require manufacturers and importers of electronic products to take responsibility for the entire lifecycle of their products, including proper disposal and recycling of e-waste. This can help create a more sustainable and circular economy by incentivizing manufacturers to design easier recycling products and reduce the overall e-waste generation.
5. Promoting Research and Innovation: Encouraging research and innovation in the field of e-waste management can lead to the development of new technologies and methods for more efficient and environmentally friendly e-waste recycling. This can include exploring options for recovering valuable materials from e-waste, such as rare earth elements, which can contribute to economic growth and reduce dependence on imports.
6. Building Partnerships and Collaboration: Collaboration among various stakeholders, including government, NGOs, the private sector, academia, and international organizations, is crucial for effective e-waste management. Building partnerships and networks can help facilitate knowledge sharing, resource mobilization, and coordinated efforts in addressing the challenges of e-waste management in Bangladesh.
7. Creating Green Jobs: Proper e-waste management can also create employment opportunities in Bangladesh. Initiatives can be undertaken to promote the establishment of e-waste recycling facilities that provide safe and formal employment for local communities, thus contributing to economic development and poverty alleviation [7].

Conclusion

E-waste management is crucial to mitigate improper disposal's negative environmental and health impacts. The international community has implemented regulations and policies to ensure the proper disposal of e-waste, while Bangladesh is still struggling to manage e-waste adequately. In conclusion, managing e-waste in Bangladesh requires a multipronged approach involving proper collection and recycling facilities, awareness and education, regulations and policies, extended producer responsibility, research and innovation, partnerships and collaboration, and the creation of green jobs. Implementing these solution proposals holistically can help mitigate the environmental and health risks associated with e-waste and contribute to sustainable development in Bangladesh.

Reference

1. Hridoy Roy, Md.Shahinoor Islam*, ShafaulHaque, M.H. Riyad, 'Electronic waste management scenario in Bangladesh: policies, recommendations, and case study at Dhaka and Chittagong for a sustainable solution, Sustainable Technology and Entrepreneurship, 1 (2022) 100025.

2. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, European Union, Jan 27, 2003. 3. Basel Convention on Hazardous Wastes, March 22, 1989.

3.Responsible Recycling (R2) Certification Program, Sustainable Electronics Recycling International (SERI), accessed Feb 26, 2023

4. Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act No. 1 of 1995).

5. E-waste Collection and Recycling. (n.d.). www.thebetterindia.com, accessed 05 May 2023.

6. Draft Guideline for E-waste Management in Bangladesh, Bangladesh Electronic Manufacturers and Importers Association (BEMIA), 2011.

চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় গ গ্রুপের শ্রেষ্ঠ আল মুমিনুরের আঁকা চিত্র

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে ভ্যালেরি অ্যান টেইলরের পক্ষে পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন তার প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন কনকর্ড রেডিমিক্স অ্যান্ড কনক্রিট প্রোডাক্টস লিমিটেড এবং কনকর্ড প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট অ্যান্ড ব্লক প্লান্ট লিঃ এর প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে
ড. সালীমুল হকের পক্ষে পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন তার প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন
এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে
পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন প্রফেসর ড. জহুরুল করিম

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে
পরিবেশ পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে
পরিবেশ পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জনাব এম, এ মতিন (মতিন সৈকত)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে পরিবেশ পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে পরিবেশ পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জনাব ইনাম আল হক

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির হাত থেকে পরিবেশ পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন বারসিক (বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ)-এর প্রতিনিধি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন CoP 27 এর মূল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন CoP 27-এ বক্তব্য রাখেন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন CoP 27-এর একটি সাইড ইভেন্টে বক্তব্য রাখেন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি'র নেতৃত্বে
জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে CoP 15-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ইবিএ প্রকল্পের মাধ্যমে হাকালুকি হাওর এলাকায় মাধবছড়া খাল, ৩টি বিল ও ১৮টি পুকুর পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত ১০ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত ১০ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধারনকৃত চূড়ান্ত পর্ব

শব্দদূষণ বিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন পবিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ও সচিব এবং বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক

বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) পরিদর্শন করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ

১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য ময়মনসিংহ রেলসেতু সংলগ্ন স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ

সবাই মিলে করি পণ - বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ

#BeatPlasticPollution

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ০২-২২২২১৮৫০০, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd